দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণে

বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
বাসদ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণে
বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

কমরেড খালেকুজ্জামান

প্রকাশক : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০২৪৭১২০২৩১
ই-মেইল : spb@bol-online.com; mail@sbp.org.bd
প্রথম প্রকাশ :সেপ্টেম্বর ২০২৩, ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২৭১৯১৭৪৭ ই-মেইল : press@gronthik.com
মূল্য : ১৫০ টাকা

ভূমিকা

১৫ ও ১৬ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের দুইদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবিরে বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র বিষয়ে দলের উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

তাঁর আলোচনায় কোন একটি দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র কেন দ্বান্দিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে? সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন গড়ে উঠার ইতিহাস, মার্কসবাদ কেন আজকের যুগে শ্রমিকশ্রেণি তথা মানবমুক্তির দর্শন? মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন সংযোজন কেন প্রয়োজন? বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণ ও বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে বিরাজমান বিতর্ক, শ্রমিকশ্রেণির সঠিক রাজনৈতিক দল কীভাবে গড়ে উঠবে, বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব ও যৌথতা গড়ে তোলার সংগ্রাম বলতে কী বুঝায়? কল্যান রাষ্ট্রের ভাবনা আসলে কি? ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাথমিক কর্মীদের বোধগম্য করে আলোচনা করেন।

রেকর্ডকৃত তাঁর আলোচনার কিছু অংশ প্রথমে আমাদের পার্টির মুখপত্র ভ্যানগার্ডের মে-জুন ২০২২ সংখ্যায় ছাপা হয়। পরবর্তীতে কমরেডদের কাছ থেকে আলোচনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের অনুরোধ আসতে থাকে।

আমাদের দল ও বামপন্থি আন্দোলনে যুক্ত নেতা-কর্মীদের এবং সারাদেশের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য শিক্ষাশিবিরে কমরেড খালেকুজ্জামানের আলোচনাটি সম্পাদনা করে পুস্তিকাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিছু দেরি হলেও পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশাকরি দেশের বামপন্থী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণ, উৎপাদন পদ্ধতি, রাষ্ট্র চরিত্র ও বিপ্লবের স্তর এবং রণনীতি- রণকৌশল নির্ধারণে সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলতে পুস্তিকাটি সহায়তা করবে। পুস্তিকাটি প্রসঙ্গে পাঠকদের মতামত আমরা প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে
বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

তারিখ : ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২৩

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র চরিত্র বিশ্লেষণে বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

কমরেড, এই শিক্ষাশিবিরে ইতিমধ্যেই আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শম্পা বসু, কমরেড মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী কমরেডদের আলোচনা শুনেছেন। দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে যে বইটি ধরে আলোচনা চলছে সেটার গুরুত্ব কী তা নিয়ে শুরুতেই দুই/চারটি কথা বলে নিতে চাই।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র

আপনারা জানেন যে, শিক্ষাশিবিরের জন্য নির্ধারিত ছিল আমাদের দলের প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র' বইটি। এই বইটির শিরোনাম থেকেই সকলে অনুমান করতে পারছেন যে, বইটিতে আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, এই একই বিষয়ের উপর দেশে হয়তো আরও অনেক বই আছে বা থাকতেই পারে। তাহলে আমরা কেন নির্দিষ্টভাবে এই বইটিই পাঠ করছি? এই বইয়ের বিশেষত্ব কী? বিশেষত্ব হলো যে, এখানে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যাকে আমরা বলি মার্কসবাদ সেই অনুসারে, আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র আলোচনা করা হয়েছে। মার্কসবাদী দর্শন অনুসারে গঠিত যে কোন বিপ্লবী পার্টির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মার্কসবাদকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়—কারণ প্রকৃতির ঘটনার প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, তার অধ্যয়ন ও অনুধাবন করার পদ্ধতিটি দ্বান্দ্বিক এবং প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কে এর ব্যাখ্যা, ঘটনা সম্পর্কে ধারণা, তার তত্ত্ব ইত্যাদি বস্তুভিত্তিক-সেই অর্থে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী। এঙ্গেলস বলেছেন যে, 'প্রকৃতির প্রতি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ কোন অলৌকিক বা ঐশ্বরিক বা প্রকৃতি-বহির্ভূত শক্তির উপস্থিতি বা সংযুক্তি ছাড়াই প্রকৃতিকে যেভাবে বিদ্যমান ঠিক সেইভাবে অনুধাবন বা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩৮২-৮৩)

কার্ল মার্কস বিশ্বপ্রকৃতি, সমাজ এবং মানব বিকাশকে দেখা ও ব্যাখ্যা করার একটি সম্পূর্ণ নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় বা আবিষ্কার করেছিলেন। তাকেই বলা হয় মার্কসীয় দর্শন, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যখন মানুষের সমাজ বিবর্তনের ধারা বা ইতিহাস বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তখন তার থেকে আমরা পেয়েছি ইতিহাস ও সমাজের অগ্রগতির মার্কসীয় তত্ত্ব, যাকে

আমরা বলি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। আবার এই দর্শনকেই বা বিচারধারাকে মার্কস যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন তখন তার থেকে আমরা পেয়েছি মার্কসবাদী অর্থনীতির তত্ত্ব বা মূল্যের শ্রম-তত্ত্বের (labour theory of value) মার্কসীয় ব্যাখ্যা।

মানব সমাজের ইতিহাসকে মার্কস-এঙ্গেলসই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানব সমাজের ইতিহাস হলো সমাজ অভ্যন্তরের নানাশ্রেণির বিরাজমান দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের পথে এগিয়ে চলার ইতিহাস, অর্থাৎ এক কথায় শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। কমিউনিস্ট ইশতেহারে প্রথমেই তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন–'The history of all hitherto existing society (that is, all written history) is the history of class struggles'। পরবর্তী সময়ে এঙ্গেলস একটি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন যে, সমাজের প্রাক-ইতিহাস অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসের আগের সময়ের যে ইতিহাস, সেখানে যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন ছিল তার সম্পর্কে ১৮৪৭ সালের আগে সবই অজানা ছিল। আপনারা জানেন যে, কমিউনিস্ট ইশতেহার লেখা হয়েছে ১৮৪৮ সালে, অর্থাৎ তাঁরা যখন সেটি রচনা করছিলেন তখন প্রাক-ইতিহাস যুগের সমাজ কেমন ছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা ছিল না। পরবর্তী সময়ে, হ্যাক্সথাউসেন (Haxthausen) রাশিয়ায় জমির সাধারণ মালিকানার বিষয়টি আবিষ্কার করেন। আবার, জর্জ লুডভিগ ভন মরার (Maurer), যিনি ছিলেন একজন জার্মান আইন বিশারদ এবং ইতিহাসবিদ, জমিতে সাধারণ সম্পত্তির বিকাশ, মধ্যযুগে শহর গঠন এবং সেই সম্পর্কিত ইতিহাসের উপর গবেষণার জন্য বিশিষ্ট। তিনি (Maurer) প্রমাণ করেছিলেন যে, এটিই ছিল সামাজিক ভিত্তি যেখান থেকে ইতিহাসে সমস্ত টিউটনিক জাতির শুরু হয়েছিল এবং ভারত থেকে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্রই গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির সমাজের যে আদিম রূপ পাওয়া গেছে তা এমনই ছিল। এই নতুন করে জানতে পারার ঘটনা ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে।[১] এরসাথে উল্লেখযোগ্য মর্গানের অত্যুজ্জ্বল আবিষ্কারের, যার কারণে এই আদিম সাম্যবাদী (communistic) সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগঠনটির সাধারণ আকার, কৌমের প্রকৃত প্রকৃতি এবং গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক জানা গিয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত শ্রমের বিকাশ তেমন ছিল না এবং সেই কারণে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণও ছিল সীমিত। ফলস্বরূপ, সমাজের সম্পদও ছিল তত সীমিত। এমন অবস্থায় শ্রমের বিকাশ যত কম, সামাজিক ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর আধিপত্য ছিল তত বেশি। শ্রমের বিকাশের সাথে উৎপাদন সামগ্রীতে বৈচিত্র্য আসতে থাকে, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উৎপাদন এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যে, গোষ্ঠীর মালিকানার ভিত্তিতে তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। সম্পদের উপর গোষ্ঠীর অধিকারের পরিবর্তে প্রথমে পরিবারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আসে এবং শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। মানবজাতি তার আদিম অবস্থা থেকে উত্তরণের পর যে সমাজ উদ্ভূত হয়েছিল তা ছিল

১. জর্জ লুডভিগ ভন মরার (১৭৯০-১৮৭২) প্রসঙ্গে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি (১৮৬৮) দ্রষ্টব্য।

পরস্পরের স্বার্থবিরোধী শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। এরপর থেকে মানবসমাজের যে অগ্রযাত্রা তা শ্রেণিসংগ্রামেরই ইতিহাস। তারপর থেকে সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রেণিদ্বন্দ্বই সামাজিক বিবর্তনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে এসেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, এই সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কেন? শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসের অগ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা মানুষকে শিখিয়েছে যে, বর্তমান সময়ের শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথেই শোষিতশ্রেণির মুক্তি আসবে। এই কারণেই শোষিতশ্রেণিকে লড়াই করতে হলে সর্বপ্রথমে যা জানতে হবে তা হলো রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র। কারণ, প্রকৃত মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম দরকার নির্দিষ্ট কালের ও নির্দিষ্ট দেশের শোষণের স্বরূপ। অর্থাৎ, সমাজের বিরাজমান শ্রেণিগুলো কী কী এবং তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও তার নিরিখে শ্রেণিবিন্যাসকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলেই একমাত্র রাষ্ট্রচরিত্র এবং সমাজ অভ্যন্তরের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করা সম্ভব। কারণ, মার্কসবাদ অনুসারে আমরা জানি যে, মানুষের অস্তিত্বের জন্যই একদিন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং তখন থেকেই মানুষ অনিবার্যভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে। উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বস্তুগত বিকাশের (development of the material forces of production) নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এই সম্পর্ক মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যেমন, যদি উৎপাদিকা শক্তি দাস-মূলক সমাজব্যবস্থার স্তরে থাকে, তবে মূল উৎপাদন সম্পর্ক হয় দাস ও দাস-মালিক। আবার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে যখন এই উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে নতুন সমাজের জন্ম দেয় তখন আসে সামন্ততন্ত্র এবং সমাজে সামন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ, মূল সম্পর্ক দাঁড়ায় রাজা-প্রজা বা জমিদার-প্রজা বা ভূস্বামী-ভূমিদাস ইত্যাদি। এই সম্পর্ক মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই গড়ে ওঠে এবং সেই অর্থে স্বাধীন। সামগ্রিকতায় এই উৎপাদন সম্পর্কগুলোই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করে, এটাই সমাজের এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি (foundation)। এই ভিত্তির উপর উপরিকাঠামো হিসাবে আইনি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয় এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজচেতনার সুনির্দিষ্ট রূপগুলি – নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিল্পকলা, চারুকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ বস্তুগত উৎপাদনের পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। মার্কসের ভাষায় – 'The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life'। যদিও সমাজ অভ্যন্তরস্থ এই বস্তুগত ভিত্তি (mode of production of material life) এবং তার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবন (social, political and intellectual life)–এই দুইয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। একে অপরটিকে প্রভাবিত করে, পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে।

এই কারণেই, যদি আমরা সমাজের পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে চাই তবে আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production of material life) বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এর সাথে জড়িত হয়ে আছে বিপ্লবের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে কোন লড়াই বা বিপ্লব সংঘটিত করতে গেলে বিরাজমান পরিস্থিতিতে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার বিষয়টি একেবারে প্রাথমিক বিষয়। যাকে আমরা কমিউনিস্টরা, বিপ্লবী লড়াইয়ের সঠিক রাজনৈতিক সংগ্রামের লাইন নির্ধারণ করা বলি। কারণ, আজকের দিনে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের নেতৃত্বে লড়াই পরিচালিত না হলে জনগণের সংগ্রাম কখনোই তার ঈপ্সিত মুক্তি তথা বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

সঠিক রাজনৈতিক লাইন বলতে আমরা কী বুঝব?

মার্কসবাদীরা সঠিক রাজনৈতিক লাইন বলতে বুঝে রাষ্ট্রচরিত্র, শ্রেণিবিন্যাস এবং বিরাজমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিপ্লবের রণনীতি (strategy) ও রণকৌশল (tactics) নির্ধারণ করা।

এখন, এই রণনীতি ও রণকৌশল বলতে মার্কসবাদ কী নির্দেশ করে সেটা আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে। আপনারা জানেন যে, কমরেড স্ট্যালিনের এই সম্পর্কিত একটি সুন্দর আলোচনা আছে। তিনি বলেছেন যে, লেনিনবাদ অনুযায়ী সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামে রণনীতি ও রণকৌশল হলো নেতৃত্বের বিজ্ঞান। (The strategy and tactics of Leninism constitute the science of leadership in the revolutionary struggle of the proletariat.) 'ফাউন্ডেশন অব লেনিনইজম'-এ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্ট্যালিন দেখিয়েছেন যে, রণনীতি হলো বিপ্লবের স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সর্বহারা শ্রেণির আঘাত হানার প্রধান দিক (Target of the main blow) নির্ধারণ করা, বিপ্লবের মূল এবং সহযোগী শক্তি (main and secondary reserves) সমাবেশের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করা এবং বিপ্লবের প্রদত্ত স্তরে এই পরিকল্পনাটির সর্বত্র বাস্তবায়নের জন্য লড়াইয়ের পথ-নির্দেশনার নামই হলো রণনীতি বা strategy of revolution।

অন্যদিকে রণকৌশল পরিবর্তনশীল এক প্রক্রিয়া-আন্দোলনের গতিপ্রবাহ, উত্থান-পতন বা আন্দোলনের জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভরশীল। রণকৌশল সংগ্রামের উত্থান বা পতনের সাপেক্ষে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণির করণীয় সম্পর্কিত লাইন নির্দেশ করে। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজনের সাপেক্ষে সংগ্রামের পুরানো পন্থাকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নতুন পন্থা অনুযায়ী লড়াই পরিচালনা করতে হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান বা পতনের সাপেক্ষে পুরনো সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো তৈরি করা, পুরনো স্লোগানের পরিবর্তে নতুন স্লোগান নিয়ে আসা, অথবা পুরনো এবং নতুন ফর্মগুলোকে একত্রিত বা সমন্বিত করা। রণকৌশলগুলি রণনীতির একটি অংশ, তারই অধীনস্থ এবং রণনীতির চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য কৌশলগত অবস্থান

(Tactics are a part of strategy, subordinate to it and serving it)। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দলের কর্মসূচির উদাহরণ দেওয়া যায়। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের অসংগঠিত অংশকে সংগঠনের আওতায় আনা এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো আমাদের বর্তমান সময়ের প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ, একমাত্র এইভাবেই আমরা একটি রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারি যা বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থাকে মোকাবিলা করতে পারে এবং একটা বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমরা যেমন নিজেদের দলের শক্তির ভিত্তিতে এককভাবে আন্দোলন করছি, তেমনি বিভিন্ন বামপন্থি দলের সমন্বয়ে বাম-জোট তৈরিতে ভূমিকা রেখে মুখ্যত তার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে তাদের সংঘবদ্ধ করার পরিকল্পনা রূপায়িত করছি। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটাই আমাদের রণকৌশল। যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়, নতুন কোন বাস্তবতা তৈরি হয় তখন আমরা সেই অনুসারে বর্তমান রণকৌশল পরিবর্তন করতে পারি। করোনা পরিস্থিতির আগে এই রণকৌশল অনুসরণ করেই আমরা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, মধ্যবিত্তদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আমাদের কর্মসূচি পালন করে আসছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সফল করে তুলবার জন্য বেশি বেশি মানুষের কাছে বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে যাওয়া। যেখানে যেমন সম্ভব ছোট ছোট ইস্যুতে দলের পক্ষ থেকে এককভাবে বা বাম জোটের সাথে যৌথভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা, জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেওয়া, সর্বহারাশ্রেণির দাবিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। বর্তমান সময়ে এইভাবেই দলের শক্তি ও সংগঠনের প্রসার ও বিস্তার ঘটানোই হলো আমাদের কৌশল। কারণ, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়।

কিন্তু, যে মুহূর্তে মারণব্যাধি 'করোনা' এলো মানুষকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে ফেলা হলো। মানুষে মানুষে স্বাভাবিক যোগাযোগ বিধি-নিষেধে আটকে গেল। তখন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক সময়ের মতো একই পদ্ধতিতে মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আর আগের মতো সম্ভব হচ্ছিল না। আবার, মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা ও প্রয়োজনটাও পাল্টে গেল। মানুষের তখন প্রাণে বেঁচে থাকাই মূল সমস্যা। কাজ নেই, খাদ্যের নিশ্চয়তা নেই। মারণব্যধিকে মোকাবিলা করার উপযুক্ত কিছুই গরিব মানুষ, মজুর শ্রেণির মানুষের হাতে নেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরনো কায়দাতেই জনগণের কাছে যাওয়া বা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমরা যদি সেই পুরনো কৌশলেই আটকে থাকতাম তবে আমাদের দলের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি দুই বছরের জন্য মুলতুবি রাখতে হতো। আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম। হতাশা আমাদের কমরেডদের গ্রাস করত। কিন্তু আমাদের কমরেডরা দ্রুত গড়ে তুললেন 'চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র', 'অদম্য পাঠশালা', 'মানবতার বাজার', 'ফ্রি-অ্যামবুলেন্স সার্ভিস', 'কমিউনিটি কিচেন' ইত্যাদি নানারকম জনহিতকর বা সমাজসেবামূলক

কর্মসূচি। গ্রামের কৃষকরা যখন লক-ডাউনের কারণে ধান কাটার শ্রমিক পাচ্ছে না, তখন সাধারণ কৃষকদের ধান কাটায় সাহায্য করতেও কমরেডদের পার্টি থেকে বলা হলো। এইসব কাজ করার জন্য নতুন আকারের বিশেষ বিশেষ সংগঠন গড়ে তুলতে হলো। এইসব সংগঠনের মাধ্যমেই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের নতুন দাবি, নতুন স্লোগান তোলা হলো। কোন বিপ্লবী এবং মার্কসবাদী দলের কাছে তো জনসেবামূলক কাজ কখনো রণকৌশলের প্রাথমিক বিষয় নয় বা মূল অংশ নয়। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক জায়গাতেই, যেখানেই সম্ভব হয়েছে বা যেখানে কমরেডরা যতটুকু পেরেছেন, আমাদের এইগুলোকেই রণকৌশলের সাথে সমন্বয় করে করতে হয়েছে। খেয়াল করলে দেখবেন যে, আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতো শুধুই জনসেবা করিনি। তার সাথে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, কোথাও কোথাও দাবি নিয়ে মিছিল হয়েছে, সরকারের অবহেলার বিরুদ্ধে এদের নিয়েই প্রতিবাদ হয়েছে, বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে সাথে রাষ্ট্রের ও সরকারের শ্রেণিচরিত্র উদঘাটন করে ঐ সমস্ত গরিব মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংগঠিত করা–দুটোই আমরা অব্যাহত রেখেছিলাম। অর্থাৎ, জনসেবামূলক প্রচেষ্টাকেই আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছি। যখন রোগের প্রকোপ কমল তখন দেখা গেল আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে, সংগঠন বিস্তৃত হয়েছে, নতুন নতুন কমরেড নতুন দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন এবং পুরনো কমরেডরাও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কীভাবে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হয় সেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। এইসব সম্ভব হয়েছে নতুন পরিস্থিতিতে রণকৌশলের সাথে সমন্বিত করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ এবং নতুন স্লোগান তোলার মধ্য দিয়ে।

তবে, শুধু এইটুকুই নয়, রণনীতি এবং রণকৌশল প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যাটি আরও একটু গভীরে বুঝতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক রণনীতি এবং সেইসাথে রণকৌশল, শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন নিজেই দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত; বস্তুগত বা স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান (objective or spontaneous) এবং বিষয়গত বা সচেতন (subjective or conscious) উপাদান। সেইসব প্রক্রিয়া যা সর্বহারা শ্রেণির সচেতন ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সংঘটিত হয় তা হল বস্তুগত বা স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুঁজিবাদের বিকাশ, পুরাতন শাসনের ভঙ্গুরতা, সর্বহারা শ্রেণি এবং তার চারপাশের শ্রেণিসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, শ্রেণিগুলির পারস্পরিক সংঘাত ইত্যাদি–এসবই এমন ঘটনা যার বিকাশ সর্বহারা শ্রেণির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এটাই হলো আন্দোলনের বস্তুগত দিক। এই প্রক্রিয়াগুলির সাথে রণনীতির প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই, কারণ রণনীতি এই প্রক্রিয়াগুলোকে ব্যাহত করতে পারে না, থামাতে পারে না বা পরিবর্তন করতে পারে না; সেখান থেকে এগিয়ে যেতে রণনীতি নির্ধারণে কেবল এই পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া হয়। এটি এমন একটি

ক্ষেত্র যা আমাদের মার্কসবাদের তত্ত্বের সাহায্যে এবং মার্কসবাদের কর্মসূচির নিরিখে অধ্যয়ন করতে হয়, বুঝতে হয়।

কিন্তু, আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, স্ট্যালিন দেখিয়েছেন আন্দোলনের একটি বিষয়গত বা সচেতন দিকও রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আন্দোলনের বিষয়গত দিক হলো শ্রমিকদের মনে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার প্রতিফলন; এটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে প্রলেতারিয়েতের সচেতন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন। আন্দোলনের এই দিকটিই মার্কসবাদী বিপ্লবী বা কমিউনিস্টদের কাছে আগ্রহের বিষয়। কারণ, এই বিষয়গত ক্ষেত্রটি বস্তুগত দিক থেকে একেবারেই ভিন্ন, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে রণনীতি ও রণকৌশলগত দিকনির্দেশনার প্রভাবের অধীন। অর্থাৎ বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়গত দিকের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শক্তি ক্রিয়া করতে পারে, তাকে প্রভাবিত করতে পারে, সেই অর্থে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেই কারণেই রণকৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে রণনীতি আন্দোলনের উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়ার গতিপথে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম, সেখানে এটা ঠিক তার বিপরীত। আন্দোলনের বিষয়গত বা সচেতন দিকের ক্ষেত্রে রণকৌশল প্রয়োগের বিষয়টি বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময়। কারণ রণকৌশল সঠিক ও সম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ সময়োপযোগী ও বাস্তবোচিত হলে তার ফল একরকম হয়। আর ত্রুটিপূর্ণ হলে ফল ভিন্নতর হয়। এর উপর নির্ভর করে যে কৌশল বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবে, বেগবান করবে নাকি আন্দোলনকে শ্লথ করবে। অথবা, আন্দোলনকে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে নাকি আরও কঠিন, বিপদসঙ্কুল এবং বেদনাদায়ক পথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেবে। তবে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, রণকৌশল নির্ধারণে অনেক সময়ে ভুল-ত্রুটি ঘটে। পরিস্থিতি ও তার গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে না পারলে ভুল হতে পারে। তাতে দলের সাময়িক ক্ষতিও হয়। কিন্তু যথার্থ বিপ্লবীরা সেই ভুল সংশোধন করে আবার নতুন পথে চলে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, মহান কমরেড লেনিনের পার্টিও এমন ভুল করেছে, কমরেড মাও-এর পার্টিও এমন ভুল করেছে। লেনিন বলেছেন যে, বলশেভিক পার্ট ১৯০৫ সালে ডুমা (অর্থাৎ জারের আমলের রাশিয়ান পার্লামেন্ট) বয়কটের ভুল কৌশল নিয়েছিল যার কারণে দলের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল অনেক। আবার 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' (On Contradiction) কমরেড মাও আলোচনা করেছেন যে, দলের ভুলের জন্য কীভাবে অনুকূল শর্তগুলি প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল এবং ১৯২৪-১৯২৭ পর্যন্ত সময়ে বিপ্লবের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৭ সালের পরে দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে বেড়ে ওঠা বিপ্লবী বেস অঞ্চলগুলি ১৯৩৪ সালের মধ্যে পরাজিত হয়েছিল। তাহলে মূল কথা হলো রণকৌশল পরিস্থিতির সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল এবং তা যদি না করতে পারা যায় তাহলে বিপ্লবের ক্ষতি হয়। কিন্তু রণনীতি বিপ্লবের প্রধান এবং সহযোগী শক্তি সম্পর্কিত বিষয়, বা সোজা ভাষায়, বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের বিষয়। রণনীতি বিপ্লবের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে গেলেই একমাত্র পরিবর্তিত হয়, একটি নির্দিষ্ট স্তর জুড়ে এটি মূলত অপরিবর্তিত

থাকে। বাংলাদেশে বাম আন্দোলনে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের ভিত্তিতে সংগ্রামের নীতি-কৌশলগত ও করণীয় নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের, যা এখনও অব্যাহত আছে। আমাদের দেশের বাম আন্দোলনে ঐক্য কিংবা বিভক্তির ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটি অনেক সময়েই অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সমস্ত দেশের ইতিহাসেই দেখা গেছে যে, রণণীতি ও রণকৌশলের পার্থক্য এবং সে সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি কমরেডদের মধ্যে গড়ে না উঠলে অনেক কমরেডের ক্ষেত্রেই বিপত্তি ঘটেছে। যখন সাময়িক কোন ভুল কৌশলের কারণে দলের ক্ষতি হয়, যেমন কমরেড মাও-এর দলের ক্ষেত্রে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাক্রম উল্লেখ করা হলো, তেমন কিছু ঘটলে এই সমস্ত কমরেডরা সব গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা মাথা খারাপ করে ফেলেন। তাঁরা বিচার করতে ভুলে যান যে, এটা কি দলের রণনীতির ক্ষেত্রে ভুল, নাকি রণকৌশলগত ভুল। তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং পার্টির বিরুদ্ধে চলে যান। যদি সত্যি তাদের মধ্যে শ্রেণিসচেতনা গড়ে উঠত, প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা থাকত, কর্তব্যবোধ থাকত তাহলে দলের পাশে দাঁড়িয়ে সাময়িক ক্ষয়-ক্ষতিপূরণে এগিয়ে আসতেন। কারণ, তাহলে তাঁরা বুঝতেন যে, এই ভুল রণকৌশলগত ভুল, এটা সাময়িক। যেমন সাময়িক ভুল করেছেন কমরেড লেনিন বা কমরেড মাও-এর পার্টিও। তা না করে তাঁরা একেকজন স্বয়ম্ভূ বিপ্লবী হয়ে ওঠেন, নিজে হতাশাগ্রস্ত হন, সমাজের অন্যান্যদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে বেড়ান, নিজের স্থবিরতাকে দলের স্থবিরতা ভেবে বা খণ্ডিত কাজের অভিজ্ঞতাকে অন্ধের হাতি দেখার মতো দেখে অথবা কয়েক বছরের মিছিল, মিটিং-এ অংশ নেয়া ও পোস্টার মারার অভিজ্ঞতাকেই বিরাট বিপ্লবী জীবন-যাপন বলে আত্মশ্লাঘা প্রচার করতে থাকেন আর পার্টিকে গালাগাল দিয়ে নানা বাক-চাতুর্য্যের আড়ালে নিজেকে বড় বিপ্লবী প্রমাণে উঠে-পড়ে প্রচার করতে লাগেন। এরা সমাজের এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্লবের ক্ষতি করেন অনেক বেশি।

যাই হোক, তাহলে সামগ্রিকভাবে বিষয়টি দাঁড়াল এই যে, কমিউনিস্ট বিপ্লবী বা মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের কাছে দেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ সেটি ব্যতিরেকে বিপ্লবের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো যে দেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ আমরা করব কীভাবে? তারজন্য আমাদের প্রয়োজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা বা দর্শন আয়ত্ত করা। আমরা উল্লেখ করেছি যে মার্কসবাদ হচ্ছে একটা বস্তুবাদী দর্শন যার বিচার পদ্ধতি হলো দ্বান্দ্বিক এবং ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতি, সমাজ এবং মানব চিন্তার পরিমন্ডল বুঝার জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এখন তাহলে বিষয়টা হলো যে এই মার্কসবাদী দর্শন কিংবা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে আমরা কী বুঝব?

দর্শন বিকাশের ইতিহাস

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদী দর্শন বা বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ করে আসেনি। তারও একটা বিকাশের ধারাবাহিকতা আছে, ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসটি অনুধাবন করলেই একমাত্র বুঝা সম্ভব যে মানব সমাজ ও বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে দর্শন কী অর্থে বা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি দর্শনের অগ্রযাত্রার সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করি, প্রাচীন গ্রিক বা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, তাহলে দেখব যে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি চিন্তাধারা – বস্তুবাদ (materialism) ও ভাববাদ (idealism) - এদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দর্শনের অগ্রযাত্রা ঘটেছে। এই দুইয়ের মধ্যে যে আমরা পার্থক্য করছি, সেটা কিসের ভিত্তিতে? অর্থাৎ ভাববাদ বা বস্তুবাদের মূল লক্ষণগুলো কী কী? এঙ্গেলস খুব সহজভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমরা প্রথমে সেই ব্যাখ্যা জেনে নেই।

'... সত্তার (being) সাথে চিন্তার সম্পর্ক, প্রকৃতির সাথে চেতনার (spirit বা ভাবের) সম্পর্ক - সমগ্র দর্শনের এবং সমস্ত ধর্মেরই সর্বোত্তম বিবেচ্য প্রশ্ন। এর শিকড় রয়েছে বর্বর যুগের সংকীর্ণ ও অজ্ঞ ধারণার মধ্যে। তবে এই প্রশ্নটি প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম রূপে সামনে আসতে পেরেছে বা এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য অর্জন করতে পেরেছে, শুধুমাত্র ইউরোপের মানবিক চিন্তা খ্রিষ্টীয় মধ্যযুগের দীর্ঘ শীতনিদ্রা থেকে জেগে ওঠার পরে। সত্তার সাথে চিন্তাভাবনার সম্পর্কের প্রশ্ন - প্রসঙ্গত, সেটি এমন একটি প্রশ্ন যা মধ্যযুগের দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করেছিল-সেই প্রশ্নটি হলো : কোনটি প্রাথমিক-চেতনা না প্রকৃতি। সেই প্রশ্নটি গির্জার সাথে সম্পর্কিত হয়ে অত্যন্ত শানিতরূপে যেভাবে উত্থাপিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন নাকি জগৎ অনন্তকাল ধরে আছে?

দার্শনিকরা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা তাদের দুটি বড় শিবিরে বিভক্ত করেছিল। যাঁরা প্রকৃতির পরিবর্তে চেতনার প্রাধান্যকে জোর দিয়েছিলেন এবং তাই, শেষ বিচারে, তাঁরা কোন না কোন আকারে ধরে নিয়েছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেউ সৃষ্টি করেছেন। দার্শনিকদের মধ্যে, যেমন উদাহরণস্বরূপ হেগেলের দর্শনে, এই বিশ্ব-সৃষ্টি প্রায়শই খ্রিষ্টধর্মের তুলনায় আরও জটিল এবং দুরূহ হয়ে উঠেছে। এদের সবাইকে নিয়ে ভাববাদী শিবির গঠিত। অন্যরা, যারা প্রকৃতিকে প্রাথমিক হিসাবে বিবেচনা করেছিল, তাঁরা বস্তুবাদের বিভিন্ন স্কুলের অন্তর্গত।

এই দুটি অভিব্যক্তি-ভাববাদ এবং বস্তুবাদ, মূলত এ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝায় না।' (এঙ্গেলস, ১৮৮৬, পৃ-৩৬৬)

তাহলে দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদ বলতে বুঝায় এমন একটা দর্শন যেটা মনে করে যে, আমাদের এই বিশ্ব-প্রকৃতি হলো চিন্তা, ভাব, পরমাত্মা বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে চেতনা (idea) থেকে সৃষ্ট অথবা কেবল মাত্র চেতনার প্রতিফলন। তাঁরা মনে

করেন যে চেতনা (idea) বিশ্ব-প্রকৃতির যে ভৌত জগত সেটা সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, চিন্তা-চেতনাই আদি, বস্তুজগত এসেছে তারপরে, এক কথায় ভাবই বস্তুর জন্ম দিয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হল এই শুদ্ধ বা নিখাদ চেতনার (perfect Idea) অসম্পূর্ণ একটা প্রতিরূপ (imperfect copy) মাত্র। বিভিন্ন ভাববাদী দর্শন তাদের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বা ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করলেও শেষ পর্যন্ত মূল সুর বা নির্যাস হলো এটাই। অর্থাৎ, সকল ভাববাদী দর্শনই এখান থেকেই শুরু করেন যে, চেতনা বা ভাবই মূল, তার থেকেই বস্তুজগত সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, সমস্ত ধর্মচিন্তাই সৃষ্টিকর্তা আছেন ধরে নিয়ে শুরু হয় আর সেই কারণেই সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থেই সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। যেহেতু ধর্মগুলো যখন এসেছে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকের মতো উন্নত ছিল না, সেহেতু সব ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব আসলে মনগড়া কতগুলো কথা।

বস্তুবাদী দর্শনের সারকথা এর ঠিক বিপরীত। বস্তুবাদী দর্শন বলে যে, আমরা যে প্রকৃতির মাঝে আছি এবং মানুষ যে প্রকৃতিরই অংশ, যে প্রকৃতিকে আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মগুলো জানতে পারি, বুঝতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি তাই হলো বাস্তব জগত এবং এই বাস্তব জগৎ হল বস্তুগত বা বস্তুময়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক, যা দিয়ে আমরা চিন্তা করি, তাও একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বিশেষভাবে সংগঠিত বস্তু। মস্তিষ্ক তো বস্তুই এবং সেই বস্তুই চিন্তা করে এবং চেতনা ও সংবেদনের জন্ম দিয়েছে বা দেয়; চেতনা বা চিন্তা বস্তুর জন্ম দেয়নি, বরং বস্তুর বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে চেতনজগত বা ভাবজগতের উৎপত্তি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি সৌরজগত বা বিশ্বব্রহ্মান্ডের তুলনায় পৃথিবীতে মানুষের উন্মেষ হয়েছে মাত্র সামান্য কিছুকাল আগে। তাহলে একসময় সৌরজগত ছিল, অর্থাৎ বস্তু ছিল কিন্তু মানুষ ছিল না। আর মানুষ যদি না থাকে তবে তো চিন্তা বা চেতনা থাকতে পারে না। কারণ প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কই একমাত্র চিন্তা করতে পারে।

আমরা আজকের দিনে যাকে বস্তুবাদ বলি, প্রাচীন বস্তুবাদ ঠিক সেই অর্থে বস্তুবাদ ছিল না। ভাববাদীরা যেমন মনে করেছে যে, চেতনাই আসল, বস্তুজগত সেই চেতনারই প্রতিরূপ, অতএব প্রকৃতির মধ্যে নিয়মকে তাঁরা অনুসন্ধান করেননি, বা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃতিকে সেইভাবে দেখতে পাননি। অন্যদিকে, আর একদল ছিলেন যাদের ভাবনা ছিল এই ভাববাদীদের বিপরীত। যাঁরা ভাববাদীদের চিন্তার বিরোধিতা করেছেন। তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁরা শুধুমাত্র এই অর্থে বস্তুবাদী যে তাঁরা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণযোগ্য বলে জ্ঞান করেছেন। যেমন অতি প্রাচীন গ্রিসে একদল দার্শনিক ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে, বস্তুরই প্রাণ আছে (matter is alive)। গ্রিকদের হাত ধরে চিন্তার বিকাশের একটা দীর্ঘ যাত্রা এই দর্শন থেকে শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার যে তাঁরা কখনোই তাদের দর্শনচিন্তার সাথে ধর্মকে জড়িত করেননি।

এইদিক থেকে এরা ছিলেন প্রাচীন মিশরীয়, প্রাচীন ভারতীয় এবং প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় প্রাচীন সভ্যতা থেকে গ্রিকরা অনেক কিছুই শিখেছিলেন। এমনকি প্রাচ্যের প্রাক-আর্য প্রাচীন সভ্যতা থেকেও শিখেছিলেন। এই কথার স্বীকৃতি সকল পুরাতত্ত্ববিদের লেখাতেই আছে। প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের একটা বইয়ের নামই হচ্ছে 'The Most Ancient East: The Oriental Prelude To European Prehistory'–অর্থাৎ ইউরোপের প্রাক-ইতিহাসের মুখবন্ধ লিখেছিল প্রাচ্য। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'ইউরোপীয় প্রাক-ইতিহাস প্রাথমিকভাবে প্রাচ্যের অর্জনকে অনুকরণের গল্প বা খুব বেশি হলে বলা যেতে পারে অভিযোজনের গল্প'। কিন্তু এই প্রাচীন গ্রিক চিন্তাবিদরা প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য দেব-দেবীদের আশ্রয় নেননি, যেমনটি প্রাচ্যের ক্ষেত্রে সত্য। লোকায়ত দর্শনের বিশিষ্ট গবেষক, ভাষ্যকার এবং বস্তুবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন প্রাচ্যে 'দর্শনচর্চা ও ধর্মসাধনা বহুলাংশেই জড়িত হয়ে থেকেছে, ধর্মের সঙ্গে দর্শনের বিচ্ছেদ হয়েছে অসম্পূর্ণ।' প্রাচীন গ্রিস বিজ্ঞানী বা দার্শনিকেরা-যেমন থ্যালেস, হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ-মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিশুদ্ধভাবে প্রকৃতির কাজ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছিলেন। এই অর্থে এবং সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল বস্তুবাদের চর্চা। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে থেকে (যখন থ্যালেসের জন্ম) শুরু করে ইউরোপের কর্তৃত্ব খ্রিষ্টধর্মের হাতে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই প্রাচীন বস্তুবাদের চর্চাই মূলত হয়েছে ইউরোপে। কয়েক হাজার বছর পরেও আমরা এখনো পিথাগোরাসের সূত্র, ইউক্লিডের জ্যামিতি, আর্কিমিডিসের সূত্র শিখি। বস্তুজগত পরিবর্তনশীল এই কথা বুঝাতে আমরা আজও সেইকালের প্রাচীন উপমা ব্যবহার করি–'মানুষ একই নদীতে দুইবার স্নান করতে পারে না।' খ্রিষ্টজন্মের ৫০০ বছর আগের প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ঠিক সেই কথা (universal flux) বুঝাতেই এই উপমা ব্যবহার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বলেছিলেন 'opposites coincide', অর্থাৎ যাকে আমরা আজ বলি unity of opposites। এই সময়টি ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্মেষের সমগ্র ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাল। থ্যালেসই প্রথম সমালোচনামূলক ঐতিহ্যের (tradition of critique) জন্ম দিয়েছিলেন যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত মৌলিক বিষয়। অনেকেই মনে করেন যে প্রকৃত বিজ্ঞান এখান থেকে শুরু হয়।

প্রাচীন গ্রিসের মতো প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেও কয়েকটি প্রবল বস্তুবাদী ধারা গড়ে উঠেছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, চার্বাক বা লোকায়ত বলতে প্রাচীনকালের কোন এক বস্তুবাদী বা জড়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়কেই বুঝাত। প্রাক-বুদ্ধ যুগের এই সুপ্রাচীন বস্তুবাদ আধুনিক যুগের বস্তুবাদের সঙ্গে অভিন্ন ছিল না, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আত্মা অস্বীকার করে জড়দেহকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ঈশ্বর ও পরলোকের কথা কল্পনা

মাত্র। তাঁরা দাবি করতেন যে, বেদ বা শ্রুতির কোনো প্রমাণ নেই। এই কারণে তাঁরা প্রচার করতেন যে বৈদিক যাগযজ্ঞ শুধু অর্থহীনই নয়-প্রবঞ্চনামূলক। খুব সম্ভবত তাঁরাই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যুক্তিবিদ্যা ও তর্কবিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন। আবার বৈশেষিক দর্শন, যার প্রবক্তা ছিলেন কণাদ, তিনি পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অনুমান করেছেন যে, বৈশেষিক দর্শনের সাথে প্রাচীন গ্রিসের পরমাণুবাদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। দুইটি দেশে পরস্পরনিরপেক্ষভাবে পরমাণুবাদের আবির্ভাব অসম্ভব নয় বলেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। এই বৈশেষিক দর্শনও অনেক প্রাচীন। কেউ কেউ খ্রিষ্টীয় ২০০-৪০০ সালে অনুমান করলেও অনেক বিশেষজ্ঞই আবার মনে করেন যে সূত্রগুলো বুদ্ধ-পূর্ব। (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ-২-৩৮) তাহলে গ্রিসের বস্তুবাদী চর্চা এবং ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারার উত্থান প্রায় সমসাময়িক।

কিন্তু, প্রাচীন গ্রিসের এই বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার ঐতিহ্য ও পরম্পরা ইউরোপে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় মধ্যযুগে। শুরু হয় চার্চের আধিপত্য। সহস্রাধিক বছর ইউরোপে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবর্তে তথাকথিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে ভিত্তি করে যে ভাববাদী চিন্তা তারই চর্চা চলতে থাকে। রেনেসাঁর যুগে আবার নতুন নতুন দর্শন চিন্তা, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রবলভাবে ফিরে আসে। কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানকে বা বস্তুবাদী চিন্তাকে ধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধে (ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট উভয় ধারার বিরুদ্ধেই) ভয়ানক যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। অনেক বৈজ্ঞানিককে তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। কোপার্নিকাস জীবিতকালে তাঁর বই প্রকাশ করতে পারেননি। আমরা জানি জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। গ্যালিলিওকে দুবার বিচারের মুখোমুখি করা হয় এবং নির্যাতনের হুমকিতে তাকে তাঁর পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক মতামত ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

মধ্যযুগের অন্ধকারের অর্গল ভাঙ্গল কেন এবং কীভাবে?

একটা প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসবে এবং সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণও বটে। তা হলো, সহস্রাধিক বছর ধরে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এমন সংস্কারাবদ্ধতা চলছিল, সেই অবস্থায় হঠাৎ করে আবার নতুন নতুন দর্শন, বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী? এটা কি ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার মেহেরবানি? আমরা আলোচনার শুরুতেই সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক সিদ্ধান্তের কথা বলেছি। মার্কস দেখিয়েছেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে যে, নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন পদ্ধতি নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তির উপর। উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির অর্থ উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার ও কলা-কৌশল এবং তার উপযোগী দক্ষ শ্রমশক্তির ব্যবহার। মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা সেই সময়ের সামাজিক

ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করি তবে একমাত্র এই ঘটনার সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। নাহলে ভাববাদীদের মতো বলতে হবে সৃষ্টিকর্তা খুশি হয়ে এই সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের সেই সময় পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এই বিষয়টি আমাদের তাই ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

মধ্যযুগে ইউরোপে ছিল স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি। মধ্যযুগকালীন সময়পর্বে পুঁজির দুটি স্বতন্ত্র রূপের জন্ম হয়েছিল ও পরিণত রূপে বিকশিত হয়েছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির আগের যুগের পুঁজি হিসাবে (quand meme -all the same) এইগুলিই বিবেচিত হয়-সেইগুলো হচ্ছে মহাজনি পুঁজি এবং বণিকি পুঁজি। (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৫০) সময়ের সাথে এই গ্রামীণ অর্থনীতিনির্ভর সমাজেই জীবন ধারণের নানা বৈচিত্র্যময় এবং নতুন নতুন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই চাহিদা মেটাতে এই দুই পুঁজি একদল দক্ষ হস্তশিল্পী এবং কারিগরের (Artisans and craftsmen) জন্ম দেয়। হস্তশিল্পী এবং কারিগররা ছিল শৈল্পিক দক্ষতার অধিকারী, উভয়েই হাতের সাহায্যে নানা উপকরণ তৈরি করতে দক্ষ। তবে হস্তশিল্পীদের প্রবণতা ছিল নান্দনিক আবেদনযুক্ত সামগ্রী তৈরি করার, অন্যদিকে কারিগরদের দক্ষতা ছিল গণহারে উৎপাদিত কার্যকরী ব্যবহার্য উপকরণ তৈরি করার। এই সমস্ত দ্রব্য স্থানীয় এবং দূরদেশে বাণিজ্যের প্রয়োজনে বণিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব ও প্রভাব সমাজব্যবস্থায় বেড়ে যায়। ইউরোপে কারিগরদের এবং বণিকদের গিল্ড ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। গিল্ড হলো কারিগর বা বণিকদের সমিতি যা পারস্পরিক সহায়তা এবং সুরক্ষার জন্য এবং তাদের পেশাগত স্বার্থের উন্নতির জন্য গড়ে উঠেছিল। একাদশ এবং ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে গিল্ডগুলি উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছিল এবং সেই যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। এই সময়পর্বে বিপুলাকারে পণ্য সঞ্চালন (circulation) প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম দিকে একই গিল্ডের অধীনে নানাধরনের পণ্য উৎপাদনের হস্তশিল্পীরাই থাকত। পরে কালক্রমে পণ্যের বাজার যতই সম্প্রসারিত হতে থাকল সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন গিল্ড গড়ে উঠেছিল। এইভাবেই এই ব্যবস্থায় হস্তশিল্পজাত পণ্য অনুযায়ী গিল্ডগুলি আলাদা হয়ে উৎপাদিত পণ্য নিখুঁত হতে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, তখনও আমরা যাকে ম্যানুফ্যাকচারিং বলি–অর্থাৎ একই ঘরে বসে (যাকে বলা যেতে পারে কর্মশালা বা ফ্যাক্টরি) একদল দক্ষ কারিগর পণ্য উৎপাদন করছে তেমনটি গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মার্কস বলেছেন সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবস্থাই ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অস্তিত্বের জন্য বস্তুগত শর্ত তৈরি করেছিল। তবে, একই কর্মশালার মধ্যে শ্রম-বিভাজন গিল্ড করেনি। এই কারণে মার্কস উল্লেখ করেছেন যে, গিল্ড ব্যবস্থা ম্যানুফ্যাকচারিং আসার বস্তুগত উপাদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে যতই অবদান রাখুক না কেন, খোলসের মধ্যে যেমনভাবে শামুক থাকে, সেইভাবে এই গিল্ড ব্যবস্থাতে সামগ্রিকভাবে, শ্রমিক এবং তার উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপায়গুলি (means of production) ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ, উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর তখনও কারিগরদের অধিকার ছিল। কিন্তু

ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্য চাই উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপায় থেকে শ্রমিককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপায়কেই (means of production) পুঁজিতে রূপান্তরিত করা। সেই কাজ ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে শ্রম-বিভাজনের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। এই জন্য মার্কস বলেছেন যে, 'পণ্য বিনিময়ের দ্বারাই সংঘটিত হোক বা অন্য কোন ভাবেই হোক না কেন, এই কথা সত্য যে, বৃহত্তর সমাজে আমরা যে শ্রমের বিভাজন এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নানারূপের অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেখি, সেইগুলো খুবই বৈচিত্র্যময়। কিন্তু কর্মশালায় যে শ্রমের বিভাজন, যেমনটি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে, তা শুধুমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির একটি বিশেষ সৃষ্টি।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৩৫৯)

পণ্যের সঞ্চালনকেই মার্কস পুঁজির সূচনা বিন্দু বলেছেন। এই পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন এবং তার সঞ্চালনের জন্য বাণিজ্যের প্রসার পুঁজির উত্থানের ঐতিহাসিক ভিত্তি গঠন করেছিল। মার্কস দেখিয়েছেন, যেই বিপ্লব পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল তা সংঘটিত হয়েছিল ১৫ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে এবং ১৬ শতকের প্রথম দশকে। মার্কস বলেছেন–'পুঁজির আধুনিক ইতিহাস ষোড়শ শতকে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য এবং বিশ্বব্যাপী বাজারের (world-embracing commerce and a world-embracing market) সৃষ্টি থেকে শুরু হয়েছে'। (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-১৪৬) অর্থাৎ, সময়কাল হলো ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ। এইসময় পণ্য বাণিজ্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে পুঁজির সঞ্চয়ন (capital accumulation)। অন্যদিকে শিল্পের জন্য যে স্বাধীন মজুরি নির্ভর শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয় সেই মজুর শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে। (মার্কস, ১৮৮৭,পৃ-৭৩৭) অর্থাৎ, তারা আর জমির সাথে সামন্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কে বাঁধা নয়, ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত। অন্যদিকে, অনেক ছোট ছোট গিল্ড-প্রভু এবং তার চেয়েও বেশি স্বাধীন ক্ষুদ্র কারিগর, এমনকি কোন কোন মজুরি শ্রমিক, নিজেদেরকে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করেছিল এবং ক্রমশ মজুরি শ্রমের শোষণের সুযোগ নিয়ে সেই অনুসারে পুঁজির সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পরিপূর্ণ পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৫০) নব্য পুঁজির মালিকদের সাথে গিল্ড-ব্যবস্থার স্বার্থের দ্বন্দ্ব তাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৩৪৯ সালে ইংল্যান্ডে এবং ১৩৫০ সালে ফ্রান্সে প্রথম মজুরি শ্রম সম্পর্কিত আইন জারি করা হয়। এইসব আইন প্রথম থেকেই ছিল ভয়ানকভাবে মজুরবিরোধী এবং উদ্দেশ্য ছিল নব উন্মেষিত শিল্প-মালিকদের মজুরকে অবাধ শোষণ করার অধিকারের সুযোগ করে দেওয়া ('from the first, aimed at the exploitation of the labourer and, as it advanced, always equally hostile to him'), (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৩৮)। মধ্যযুগে যে প্রক্রিয়ায় ভূমিদাসদের মুক্ত করে শহর-গঞ্জ গড়ে উঠেছিল তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। 'এই পদ্ধতির শম্বুক গতি ১৫ শতকের শেষের মহান আবিষ্কারগুলির তৈরি করা নতুন বিশ্ব বাজারের বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তার সাথে কোনভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৫০) অর্থাৎ, এই সময়ের নতুন

নতুন আবিষ্কারের জন্য পুঁজির প্রসার ঘটতে থাকল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ভিত্তি করে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ঘটতে থাকল ঠিক, কিন্তু একই সাথে বিজ্ঞানের কাছে নতুন নতুন সমস্যা নিয়েও উপস্থিত হলো। আবার, শুধু পণ্য উৎপাদন করলেই তো হবে না, সেই পণ্যকে বাজারে পৌঁছে দিতে হবে। শুধু স্থানীয়ভাবে স্বদেশের ভেতরে না, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করা ভিন্ন ভিন্ন দেশে। পণ্যকে বিশ্বের নানাপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়াই তখন প্রধান বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা। এই কারণেই, বিশেষত, প্রাচ্যের সাথে বিকল্প বাণিজ্য পথ অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। সিল্ক রুট ধরে প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমের মধ্যে যেভাবে সড়ক পথে এতদিন পণ্য পরিবহন হয়ে এসেছে, সেইভাবে পণ্য পরিবহন ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘ সময়, পথে নানা অনিশ্চয়তা, সুদীর্ঘ পথযাত্রায় দস্যুদের হাত থেকে মাল বাঁচানোর জন্য ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের ব্যয় এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণ পণ্য একসাথে পাঠানোর অসুবিধাই সড়ক পথের পরিবর্তে সমুদ্রপথ অনেক বেশি আগ্রহের কারণ হয়ে উঠল। নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের কারণে পণ্য-সম্ভারের চরিত্রও অনেকটা পাল্টে গেছে, শুধুমাত্র সিল্ক এবং মশলা বাণিজ্যিক পণ্য ছিল না। তাছাড়া, স্থলপথের তুলনায় সমুদ্রপথে জাহাজের গতি বেশি এবং পণ্যও অনেকবেশি পরিবহন করা সম্ভব। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে মধ্য এশিয়ার স্টেপ্পে মঙ্গোলের (Mongol heartland in the Steppe of central Asia) কেন্দ্রস্থল থেকে উদ্ভূত হয়ে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দানিউব নদী এবং পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অধীন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে সিল্ক-রুটের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বহীনতার কারণে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই কারণে ঐ পথে বাণিজ্য হয়ে ওঠে অসম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ। তার উপর, ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর সিল্ক রুট ইউরোপিয়ানদের জন্য কার্যত বন্ধই হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র পথে বাণিজ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমুদ্রপথে এতদিন পাল তোলা ছোট ছোট পোত চলত এবং তা চলত উপকূলের কাছ দিয়ে। কিন্তু এখন প্রয়োজন দেখা দিল বেশি করে মাল পরিবহনের উপযুক্ত বড় আকারের পোত। সমুদ্রপথের উপযোগী বড় বড় পোত তৈরি করতে হলে প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন জাহাজের নকশা। কিন্তু নকশা তৈরি করতে হলে দরকার জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিশীলতার (Hydrostatics) যে যৎসামান্য জ্ঞান আর্কিমিডিসের আমল থেকে জানা ছিল তার ব্যাপক উন্নতিসাধন এবং তরল মাধ্যমে চলমান বস্তুর নিয়মগুলি (Hydrodynamics) ভালোভাবে জানা। উপকূলের ধার ঘেঁসে না চলে সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল মাঝদরিয়ায় জাহাজের অবস্থান জানা। এতদিন চাঁদ-তারা আর সূর্যের অবস্থান দেখে দিকনির্ণয় করা হচ্ছিল। রেনেসাঁর সময় মধ্যযুগে বিকশিত সরঞ্জামগুলিই ব্যবহার করা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যাকে বলা হতো অ্যাস্ট্রোল্যাব। এটি একটি বহনযোগ্য যন্ত্র যা নাবিকদের তাদের পথ খুঁজে

পেতে সাহায্য করত। অ্যাস্ট্রোল্যাব দিগন্তের উপরে সূর্য এবং নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করে অক্ষাংশ নির্ধারণে সাহায্য করত। তখন পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রায় এটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ম্যাগনেটিক কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল তাকেও আরো উন্নত করার প্রয়োজন দেখা দিল। কলম্বাসের আমেরিকা অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, পুরনো ঐসব সরঞ্জাম যথেষ্ট নয়। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় গ্রহ-তারাদের অবস্থান সঠিকভাবে না জানলে তাদের পর্যবেক্ষণ করে জাহাজের অবস্থান জানা ছিল অসম্ভব। এই কারণে গ্রহদের গতির নিয়মগুলো জানার বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিল। কাজেই, একসাথে হাইড্রো-স্ট্যাটিকস, হাইড্রো-ডায়নামিক্স, মেকানিক্স, অ্যাস্ট্রনমি ইত্যাদি নানা শাখায় যে গবেষণা শুরু হলো তার বাস্তব পরিবেশ এবং তাগিদ তৈরি হয়েছিল সমাজ অভ্যন্তরে। তখনই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরাও বুঝতে পারলেন যে, বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যে ফলাফল বা তথ্য তাঁরা পাচ্ছেন, তা আর সহস্রাধিক বছর ধরে অ্যারিস্টটল-প্লেটোর দর্শনকে সত্য মেনে চললে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। উন্মেষ ঘটল রেনেসাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান। অর্থাৎ, এই নতুন চিন্তার বস্তুগত উপাদান সমাজের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। এটি একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিন্তু, রেনেসাঁর চিন্তা-ভাবনা ও বিজ্ঞান-দর্শনের উদ্ভবের প্রসঙ্গে আজকে আপাতত এই সংক্ষিপ্ত পটভূমিকাটুকু জানা প্রয়োজন। কারণ, তা নাহলে ভাববাদী প্রচারণায় বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা আমরা আগে বললাম, যে এই সময় মানুষের কল্যাণে হঠাৎ করে সৃষ্টিকর্তা সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক পাঠিয়েছিলেন। অথবা, মনে হবে বড় বৈজ্ঞানিক চিন্তা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় হঠাৎ করে এই সময় চিন্তাবিদদের মাথায় আসে আর তার জন্য সৃষ্টিকর্তা একটা আপেল নিউটনের মাথায় টুপ করে ফেলে দিলেই হলো।

প্রাচীনকালেই মানুষ, যেমন গ্রিসের একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ অ্যারিস্টার্কাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০-২৩০), আকাশের নক্ষত্রের সাথে গ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘোরে। অর্থাৎ, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো আবর্তিত হচ্ছে (heliocentric) এই ধারণা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি সূর্য এবং পৃথিবীর আকার এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বও গণনা করেছিলেন। (ড্রেয়ার, ১৯০৬, পৃ-১২৩-১৪৫) অর্থাৎ এই সমস্ত সত্য মানুষ আগেই জেনেছিল, কিন্তু মধ্যযুগে চার্চের প্রভাবে তা চাপা পড়েছিল, প্রচারিত হতে পারেনি। বলা যেতে পারে রেনেসাঁর কালে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই সত্য পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। অর্থাৎ, মধ্যযুগে ইউরোপে যখন চার্চ সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে তখন ধর্মগ্রন্থে লিখিত কুসংস্কারকে মান্যতা দিতে গিয়েই বিজ্ঞানচর্চা ও বস্তুবাদী দর্শন তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। আগে পুঁজির উন্মেষের বস্তুগত যে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করলাম, সেই বাস্তবতার কারণেই পঞ্চদশ শতকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানচর্চা ও দর্শনচর্চা আবার শুরু হয়। অ্যারিস্টার্কাসের কথা চাপা পড়ে যাওয়ায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রহগুলো সত্যিই সূর্যের চারপাশে ঘোরে কিনা তা নিয়ে বড় বিতর্ক ছিল। টাইকো ব্রাহের একটি ধারণা ছিল যা অন্যদের থেকে আলাদা। তার ধারণা ছিল যে, গ্রহগুলির

গতির প্রকৃতি সম্পর্কে এই বিতর্কগুলি সবচেয়ে ভালোভাবে সমাধান করা সম্ভব যদি আকাশে গ্রহগুলির প্রকৃত অবস্থান এবং তাদের সরণ যথেষ্ট সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। যদি পরিমাপ করে জানা যায় যে, গ্রহগুলি ঠিক কীভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে, তাহলে সম্ভবত সূর্যকেন্দ্রিক না পৃথিবীকেন্দ্রিক তার যে কোন একটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এটি একটি দুর্দান্ত ধারণা ছিল যে, কিছু খুঁজে বের করার জন্য, গভীর দার্শনিক তর্ক চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সতর্কতার সাথে কিছু যত্নসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ভালো। এই ধারণা অনুসরণ করে, টাইকো ব্রাহে কোপেনহেগেনের কাছে হেভেন দ্বীপে তার মানমন্দিরে বহু বছর ধরে গ্রহের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফল নোট করেছিলেন। তিনি গ্রহদের সময়ের সাথে অবস্থানের এক বিশালাকার টেবিল তৈরি করেছিলেন। টাইকোর মৃত্যুর পরে গণিতবিদ কেপলার সেই তথ্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেই পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসা তথ্য থেকে গ্রহের গতি সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম কেপলার আবিষ্কার করেন যেগুলো খুবই সুন্দর এবং অসাধারণ, কিন্তু সহজ।

বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তার আধুনিক যুগের উন্মেষ

আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১), কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) এবং দার্শনিক বেকন (১৫৬১-১৬২৬) এঁরা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬) জন্মও এই সময়েই। বিজ্ঞানীদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা এক অর্থে বস্তুবাদী, অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং তারপরে তার থেকে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ। দর্শনের জগতেও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ক্রমশই বিস্তার লাভ করতে থাকে। বস্তুত তখন বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্যও করা হতো না–বিজ্ঞানকে বলা হতো প্রকৃতির দর্শন। নিউটনের বিখ্যাত বইয়ের নামও হলো *ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপিল অব ন্যাচারাল ফিলসফি*। রেনেসাঁর প্রধান দার্শনিক প্রবণতা হয়ে ওঠে এক অর্থে বস্তুবাদ। ইংল্যান্ডে দর্শনের যে নতুন স্কুলের আবির্ভাব ঘটে তা হলো অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism)। তাঁরা বললেন যে, সমস্ত জ্ঞান উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয় (senses) থেকে। এই স্কুলের পথপ্রদর্শক ছিলেন ইংল্যান্ডের ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস এবং জন লক – এদের নাম বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে পড়ানো হয়। এই বস্তুবাদী দর্শন ইংল্যান্ড থেকে আসে ফ্রান্সে। সেখানে ডিডরোট, রুশো, হলবাখ, হেলভেটিয়াস প্রমুখ চিন্তাবিদের হাতে বিদ্যমান সমাজের সমালোচনা করার জন্য এই দর্শন হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে এদের মতবাদ বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ পদ্ধতিকে মধ্যযুগের ভাববাদী চিন্তার সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে মুক্তি দিতে নতুন বিচারপদ্ধতির (eliminative induction) জন্য এদের মধ্যে বেকন অধিক আলোচিত। গ্যালিলিও এবং বেকন উভয়েই বিজ্ঞানে অ্যারিস্টটলের আপ্তবাক্যের কর্তৃত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বেকন অ্যারিস্টটলের সিলোজিস্টিক পদ্ধতির সমালোচনা দাঁড় করালেন। সিলোজিজম হলো একটা পদ্ধতি যেখানে একটা 'প্রধান

প্রতিজ্ঞা' (major premise) থেকে অবরোহী যুক্তির সাহায্যে উপসংহারে পৌঁছান হয়। অন্যদিকে, একই সময়ে গ্যালিলিও প্রায় দুই হাজার বছর ধরে আধিপত্যবিস্তারকারী অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলোকে নস্যাৎ করলেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাযুজ্য ছিল এবং সম্ভবত গ্যালিলিওর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তৎসংক্রান্ত ফলাফলগুলো বেকনকে তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা একে অপরের কাজ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বেকন তাঁর বই *দ্য অর্গানন* প্রকাশ করেন ১৬২০ সালে। তার আগেই গ্যালিলিওর টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল এবং বেকন তা পাঠ করেছিলেন। এমনকি তাঁর বই প্রকাশের আগে বন্ধুর মাধ্যমে গ্যালিলিওর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিও বেকন পাঠ করেছিলেন। বেকন তাঁর *দ্য অর্গানন* বইতে গ্যালিলিওর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে টেলিস্কোপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ থেকে নিউটনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি তাকে মুগ্ধ করেছিল।

বেকনের বিজ্ঞান-দর্শনের মূল কথা হলো আরোহ-প্রণালীনির্ভর যুক্তি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী সমস্ত পদ্ধতি এই কারণে ত্রুটিপূর্ণ যে কতগুলো সাধারণ প্রস্তাব (hypothesis), যেগুলোকে নির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই সাধারণ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তার থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করা হয়। তিনি সেই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে বললেন যে, তার পরিবর্তে আগাম কোন তত্ত্ব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-সংগ্রহ হতে হবে কোন রকম পূর্ব-অনুমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া, একেবারে বিশুদ্ধ বা unbiased। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের যৌক্তিক ফলাফল সাধারণীকরণের বা (generalisation) মাধ্যমেই একমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। সেইভাবে বিজ্ঞানের যে নিয়ম জানা যাবে বা তত্ত্ব গড়ে উঠবে তার দ্বারাই ভবিষ্যদ্বাণী (prediction) করা সম্ভব। এই কারণেই তিনি গ্যালিলিওর জোয়ারের (tide) ব্যাখ্যা মানেননি। বলেছিলেন 'গতির এই বৈষম্যের ভিত্তিতেই গ্যালিলিও সমুদ্রের প্রবাহ এবং পুনঃপ্রবাহ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, অনুমান করেছিলেন যে জল অনুসরণ করতে পারার চেয়েও দ্রুতগতিতে পৃথিবী ঘোরে এবং তাই জল প্রথমে একটি স্তূপে জড়ো হয় এবং তারপরে আছড়ে পড়ে, একটা জলভরা গামলা জোরে ঘোরালে যেমনটা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এটি তিনি এমন একটি অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন যা অনুমোদন করা যায় না, কারণ জোয়ারের নিজস্ব গতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত না হয়েই তিনি অনুমান করে নিয়েছেন যে, পৃথিবী চলমান বলেই এমন ঘটছে।' অর্থাৎ, অপরীক্ষিত কোন অনুমানকে সত্য ধরে নিয়ে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে আসাকে বেকন বাতিল করে দিয়েছেন। বেকনের নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের বিকাশকে উদ্দীপ্ত করেছিল। পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণকে উৎসাহিত করেছিল। আপ্তবাক্যকে প্রমাণ হিসেবে অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছিল। যদিও গ্যালিলিও

এবং বেকনের পদ্ধতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও, কিছু পার্থক্যও আছে, তবে সেসব বিস্তৃত আলোচনার পরিসর আজকে নেই।

বেকনিয় দার্শনিক ভাবনার উজ্জ্বল অনুসারী আইজাক নিউটন। যদিও নিউটন যে সকল বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন এবং নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন তাদের মধ্যে একটা আপাত বৈপরীত্য আছে। যেমন, আলোকবিদ্যা (optics) এবং অরবিটাল মেকানিক্স। পদার্থবিদ্যায় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 'নিউটনিয়ান' পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে নিউটনের অপটিকস এবং প্রিন্সিপিয়া থেকে। অপটিকসে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন হয়েছে সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অপরদিকে, তাঁর প্রিন্সিপিয়াতে সিদ্ধান্ত করার পদ্ধতি হলো গাণিতিক তত্ত্ব। কিন্তু, এই দুটি পদ্ধতির মধ্যেও যা গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ উপাদান হিসাবে উপস্থিত তা হলো অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বের উপর নিউটনের প্রবল আস্থা। এমনকি অস্থায়ীভাবে কোন তত্ত্বকে গ্রহণ করতে হলেও সেটাই তাঁর ভিত্তি। সেই সময়ে প্রচলিত বিজ্ঞান পদ্ধতির (method of hypotheses) বিরুদ্ধে তিনি যে চারটি নিয়মের কথা প্রিন্সিপিয়াতে বলেছেন (Rules of Reasoning in Philosophy) তার চতুর্থটিতে বলা হয়েছে 'পরীক্ষামূলক দর্শনে, ঘটনা থেকে আরোহী পদ্ধতিতে উপনীত প্রস্তাবনাগুলি (proposition) যদি কোন অনুমানের (hypothesis) বিরোধীও হয় তা সত্ত্বেও সঠিক বা প্রায় সঠিক বলে ধরে নেওয়া উচিত, যতক্ষণ না অন্য কোন ঘটনার কারণে এই ধরনের প্রস্তাব আরও সঠিক বা ব্যতিক্রম হিসাবে প্রমাণিত হয়।' (নিউটন, ১৭২৯, পৃ-৪০০)

নিউটনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের তথ্যের সাথে সঙ্গতিসূচক না হলে যুক্তিসম্মত তত্ত্বকে মান্যতা না দেওয়ার একটি চমৎকার ঘটনার কথা আমাদের জানা আছে। বিশিষ্ট পদার্থবিদ ফাইনম্যান তাঁর লেকচার সিরিজে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো কেপলারের দেওয়া তিনটি সূত্র এবং তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যার প্রাপ্ত তথ্য থেকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে নিউটন অভিকর্ষ তত্ত্বের সূত্রটি অনেক আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু, তারপর সেটিকে একইভাবে পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলেন। সেই গণনায় পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব সেই সময় জানা ছিল নিউটন সেটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু, নিউটন তাঁর চাঁদের সাপেক্ষে গণনার ফলাফলের সাথে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বড় রকমের অসঙ্গতি দেখতে পান। তথ্যের সাথে অসঙ্গতি লক্ষ্য করে তিনি তাঁর মহাকর্ষ সূত্রটি প্রকাশ করেননি। ছয় বছর পরে একদল বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আকার নতুন করে নির্ণয় করতে গিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের একটি নতুন পরিমাপ নির্ণয় করেন এবং জানা যায় যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এতদিন চাঁদের একটি ভুল দূরত্ব ব্যবহার করছিলেন। নিউটন যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি সংশোধিত দূরত্বের পরিমাপ দিয়ে আবার সূত্রের ফলাফল নির্ণয় করেন এবং তত্ত্বের সাথে সুন্দর সঙ্গতি পেয়ে তবেই তাঁর অভিকর্ষ তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন।

ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন স্থানের (space) এবং কালের (time) ইতিহাস আছে

বেকনের পর, ইউরোপের দর্শনের ও যুক্তিশাস্ত্রের জগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট উপস্থিত হলেন। কান্ট যদিও শুধুমাত্র দার্শনিক এবং যুক্তিশাস্ত্র বিশারদ নন, তিনি বৈজ্ঞানিকও ছিলেন এবং বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও করেছিলেন। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে (পাশাপাশি অন্যান্য গ্রহ ব্যবস্থারও) তাঁর নেবুলার হাইপোথিসিস এখনো সাধারণভাবে সঠিক মনে করা হয়। পরে ল্যাপলাস এটার গাণিতিক ভিত্তি দিয়েছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত দর্শনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার মুখে দাঁড় করালেন। তাঁর *দ্য ক্রিটিক অফ পিওর রিজন* বইটি ছিল যুক্তির গঠন (forms of logic) সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। অ্যারিস্টটলের হাতে যুক্তির গঠন সম্পর্কিত ভাবনার সূচনা হওয়ার পর থেকে সেই অবস্থাতেই প্রস্তাবনাগুলো কার্যত প্রশ্নাতীত বিষয় হিসাবে ধরা হতো। দর্শনের ক্ষেত্রে কান্টের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা এঙ্গেলস আলোচনা করেছেন। কান্টের আগে পর্যন্ত নিউটনের বলবিদ্যার প্রভাবে এমন একটি ধারণা ছিল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হঠাৎ এক দৈব অভিঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, এই যে গতিময় সৌরজগত তার গতি এলো কোথা থেকে? বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে তো কোন বস্তুর সচল হওয়ার কথা নয়, যেমনটি নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র বলে। এঙ্গেলস লিখেছেন, প্রকৃতির প্রতি এই স্থবির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম ফাটল ধরিয়েছিলেন একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী নয়, একজন দার্শনিক এবং তিনি হলেন কান্ট। ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত কান্টের বইতেই[২] সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রথম ধাক্কার প্রশ্নটি দূর করা হয়েছিল। কান্ট বলেছিলেন যে, পৃথিবী এবং পুরো সৌরজগৎ হঠাৎ করে আসেনি, সৃষ্টি হয়েছে সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে। এঙ্গেলস আক্ষেপ করেছেন যে, কান্টের এই একটি অত্যুজ্জ্বল আবিষ্কার থেকেই প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা এমনসব সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন যার জন্য তাদের অফুরন্ত বিচ্যুতির ভুল পথে চলে অপরিমেয় পরিমাণ সময় এবং শ্রম অপচয় করতে হতো না। কান্টের আবিষ্কারের গুরুত্ব এই ছিল যে, যদি বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারতেন যে পৃথিবী একসময় সৌরজগতের গ্রহ হিসাবে সৃষ্টি হয়ে সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অস্তিত্বে এসেছে, তবে তো তার সাথে তাদের কাছে এটাও স্পষ্ট হত যে, বর্তমান ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীরাও একইভাবে সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অস্তিত্বে এসেছে। তাহলে তো স্থানের (space) এবং কালের (time) ইতিহাস আছে, উত্তরাধিকার আছে। (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩২৩-৩২৪)

তবে, একই সাথে দর্শনের অনেক মৌলিক প্রস্তাবনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব কান্ট (তাঁর পরিভাষায় Antinomies) সামনে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু, তিনি এই দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিশ্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যদিও আমরা বস্তুর অস্তিত্ব জানতে পারি, কিন্তু আমরা

২. Universal Natural History and Theory of the Heavens

কখনই তার 'স্বরূপ' (things in themselves) কেমন তা জানতে পারি না। অর্থাৎ কান্ট শেষ পর্যন্ত দার্শনিক জর্জ বার্কলে এবং ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদী ডেভিড হিউমের কথাই বলেছেন। কান্টের আগেই তাঁরা এই কথাই বলেছিলেন। তাদের মৌলিক যুক্তিটি মূলত এইরকম; 'আমি আমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করি। অতএব, আমি যা জানি সবই আমার ইন্দ্রিয় অনুভূতি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা কি জানতে পারি? যেমন, কোন ফলের কথা যদি ধরি, তবে আমি কি ফলের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানতে পারি? আমি শুধু বলতে পারি যে আমি এটি দেখি, আমি এটার স্পর্শানুভূতি পাই, আমি এটির গন্ধ পাই, আমি এটির স্বাদ পাই। এর বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলতে পারি না। অতএব, আমি সত্যিই বলতে পারি না যে, বস্তুগত জগতে আদৌ সেটা কোন রূপে বিদ্যমান।' এই হলো সাবজেক্টিভ আইডিয়ালিজম। তাদের কাছে দ্রষ্টা চোখ বন্ধ করলে পৃথিবীর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত, এটি চূড়ান্ত ভাববাদী আত্মজ্ঞানবাদের (solipsism) দিকে নিয়ে যায়, অর্থাৎ যার সারমর্ম হলো যে 'শুধুমাত্র আমিই বিদ্যমান'। *মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম* বইতে প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন এই কথা উল্লেখ করেছেন-'এই দর্শনের অযৌক্তিকতা এই সত্যে নিহিত যে এটি আত্মজ্ঞানবাদের দিকে নিয়ে যায়, শুধুমাত্র একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে।' (লেনিন, ১৯০৯, পৃ-৯৪)

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একসময় অভিজ্ঞতাবাদ মানুষের চিন্তা ও বিজ্ঞানের বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মননশীল চিন্তার জগতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা চার্চের যে কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন এসে তার সাথে ছেদ ঘটায়। এই দর্শনই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করে। এটা এক অর্থে বেশ বড় রকমের বিপ্লব ছিল বলা চলে। কিন্তু, বিজ্ঞান যতই আধুনিক গবেষণার দিকে অগ্রসর হতে থাকল তখন সেই পরিসরে অভিজ্ঞতাবাদের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বুঝা গেল যে শুধু পর্যবেক্ষণ, তথ্য-সংগ্রহ এবং আরোহী যুক্তি প্রণালী যথেষ্ট নয়। আরোহী যুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে 'তথ্য'-এর সঙ্গে সঙ্গতিসূচক ও অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝা যায় না এবং সেই কারণে সত্য বুঝতে হলে নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই।

অভিজ্ঞতাবাদীদের আরোহী যুক্তির সীমাবদ্ধতা

অভিজ্ঞতাবাদীদের আরোহী যুক্তি প্রণালীর এই সীমাবদ্ধতা বুর্জোয়া বিশ্বের দার্শনিকদের কেউ কেউ বুঝেছেন মাত্রই গত শতকে। যেমন, কট্টর মার্কসবাদবিরোধী এবং গত শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী বিজ্ঞানী-দার্শনিক কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪) এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এদের জানা নেই বা জানা থাকলেও মার্কসবাদের বিরোধিতার কারণে এই সত্যকে গোপন করেছেন যে, আগের শতাব্দীতেই এঙ্গেলস আরোহী যুক্তি প্রণালীর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এঙ্গেলসের

সময় থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে থেকে বিভিন্ন প্রাণীদের নানা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে আরোহী পদ্ধতি মেনে নানা প্রজাতিতে বর্গীকরণ বা শ্রেণিবদ্ধকরণ (categorization and classification) করা হচ্ছিল। যেমন, সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে ভাবা হয়েছিল যে ক্রেফিশ এবং মাকড়সা হলো 'পোকামাকড়' শ্রেণি এবং অন্যান্য সমস্ত নিম্ন প্রাণী হলো 'কীট'। আবার, জৈবজগতের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে আরোহী যুক্তি প্রণালীর সাহায্যেই বুঝা গেল যে, সেইগুলো সঠিক হচ্ছে না। এঙ্গেলস অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, অবরোহী যুক্তি প্রণালীর পরিবর্তে তথাকথিত আরোহী যুক্তি প্রণালীর সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন সুবিধা নেই। এই প্রণালী অনুযায়ী সিদ্ধান্তও একইরকম মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। যেমন, তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পর্যবেক্ষণে পাওয়া যাচ্ছিল যে, সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ল্যাকটিয়াল গ্রন্থি আছে। অতএব, আরোহী যুক্তি প্রণালী অনুসারে বিচার করে সেই সময় সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে, যাদের ল্যাকটিয়াল গ্রন্থি আছে তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী। একসময় তাই স্তনবৃন্ত ছিল স্তন্যপায়ী প্রাণীর চিহ্ন। এঙ্গেলস প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যুক্তিশাস্ত্রের এই ধারা অনুসরণ করে কি এটা প্রমাণ করা যায় যে কখনই কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া যাবে না যার ল্যাকটিয়াল গ্রন্থি নেই? এঙ্গেলস প্লাটিপাসের (platypus) উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, এর তো কোনটাই নেই - না ল্যাকটিয়াল গ্রন্থি, না স্তনবৃন্ত। আরোহী যুক্তি-কাঠামোর দূর্বলতা বুঝা যাবে যদি সহজ করে বলি। ধরা যাক, কেউ দশ জায়গায় গিয়ে রাজহাঁস দেখতে পেলেন যাদের প্রত্যেকের রং সাদা, কিন্তু তা থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না একাদশতম জায়গায় গিয়ে তিনি যে রাজহাঁস দেখবেন তার রং কালো হবে না। অর্থাৎ শত শতবার পর্যবেক্ষণের পরও কখনই সাধারণীকরণ করে বলা যাবে না যে, রাজহাঁসের রং সাদা।

আজকের সময়ে চিন্তা করলে এই সমস্ত বিতণ্ডাকে অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসকে দর্শন অনেকসময়ই প্রভাবিত করেছে। কখনো কখনো সময় এবং শ্রমের অপচয়ের কারণ হয়েছে, যেমনটা এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ অনেক। যেমন, নোবেল জয়ী বিশিষ্ট কণাপদার্থবিদ স্টিভেন ওয়েইনবার্গ বলেছেন- 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পরমাণুর ধারণাটি বেশিরভাগ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিল-কিন্তু পরিচিত হলেও তখনও সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। ... জার্মানিতে পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। এটা এই কারণে নয় যে জার্মান পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদরা পরমাণুতে ইতিবাচকভাবে অবিশ্বাস করেছিলেন। বরং, ভিয়েনার আর্নস্ট মাখ (১৮৩৬-১৯১৬) কেন্দ্রিক একটি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বিদ্যালয়ের প্রভাবে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের তত্ত্বগুলিতে পরমাণুর মতো এমন কিছু যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না তাকে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত ছিলেন। আবার অন্যরা, যেমন অত্যন্ত বিশিষ্ট তাত্ত্বিক লুডভিগ বোল্টজম্যান (১৮৪৪-১৯০৬) এর মতো বৈজ্ঞানিক যিনি তাপীয় তত্ত্ব তৈরি করতে পরমাণুর অনুমান ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই কারণে তাকে তাঁর সহকর্মীদের অস্বীকৃতির শিকার হতে হয়েছিল। বলা

হয় যে, মাখের অনুগামীদের দ্বারা বোল্টজম্যানের কাজের বিরোধিতা ১৯০৬ সালে বোল্টজম্যানের আত্মহত্যার কারণ।' (ওয়েইনবার্গ, ১৯৮৩, পৃ-২-৩)

তেমনি আরও একটা ঘটনা ওয়েইনবার্গ বলেছেন। আমরা জানি ১৮৯৭ সালে টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। তারও আগে জার্মান বিজ্ঞানী কাউফম্যান অনেকবেশি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে একটা মৌলিক কণা আবিষ্কার করেছেন সেটা কাউফম্যান দাবিই করেননি। কেন? 'হার্টজ এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার অন্যান্য পদার্থবিদদের মতো, কাউফম্যান ভিয়েনিজ পদার্থবিদ এবং দার্শনিক আর্নস্ট মাখের (১৮৩৬-১৯১৬) বৈজ্ঞানিক দর্শন এবং তার অনুসারী গোষ্ঠীর দ্বারা এমন গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি মনে করেছিলেন পরমাণুর মতো সত্তা যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে বলা বা চিন্তা করা অবৈজ্ঞানিক কাজ।' (ওয়েইনবার্গ, ১৯৮৩, পৃ-৭১)

সঠিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্তে কেমন বিপত্তি ঘটে তার অনেক উদাহরণ আছে, তবে একেবারে হাল-আমলের বহুল আলোচিত একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিংশশতকে এই বিতর্ক প্রকৃতিকে প্রায় অজ্ঞেয় করে তুলেছিল। আমরা জানি যে, হাইজেনবার্গের গবেষণালব্ধ ফলের জন্যই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন হয়েছিল। কিন্তু, যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তা ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সূক্ষ্ম ছদ্মাবরণের আড়ালে সাবজেক্টিভ আইডিয়ালিজমের অন্যতম এক ঘরানার চিন্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তথাকথিত 'কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা' উদ্ভূত হয়েছিল। বিষয়টা উদ্ভূত হয়েছিল একটা ইলেকট্রনের বা কণার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার সমস্যা থেকে। আমরা একটা ইলেকট্রনের অবস্থান বা ভরবেগ কীভাবে নির্ণয় করতে পারি? একমাত্র সেটিকে দেখেই আমরা বলতে পারি। ইলেকট্রন তো আর খালি চোখে দেখা যায় না, আমাদের দেখতে হবে কোন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে। আমরা যেমন অন্ধকারে টর্চের আলো ফেললে দেখতে পাই, তেমনিভাবে ইলেকট্রনের গায়ে আলো ফেলতে হবে, যাতে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সে ফেরত আসে। কিন্তু, আমরা জানি আলো কণার মতো আচরণ করে। তাহলে এর অর্থ হবে আলোর কণা অর্থাৎ ফোটন দিয়ে সেটাকে আঘাত করা। এখন কণার অবস্থান খুব ভালোভাবে জানতে হলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ যত কম হবে তত ভালোভাবে বা নির্দিষ্টভাবে তার অবস্থান পরিমাপ করা যাবে। কিন্তু, আলোর ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি শক্তি বহন করে এবং সেই কারণে ফোটন কণার ধাক্কায় ইলেকট্রনের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে ভরবেগ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আমরা অবস্থান ভালোভাবে পরিমাপ করতে পারলেও ভরবেগ জানতে পারব না। সাধারণভাবে, ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে, কণাটির ভরবেগকে পরিমাপে তত বেশি ব্যাঘাত ঘটবে। বিপরীতভাবে, আলোর দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম শক্তি বহন করে এবং সেই কারণে, পরিমাপ করা

গতিবেগে কম ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু, তরঙ্গদৈর্ঘ বেশি হওয়ায় কণার অবস্থান সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। অর্থাৎ, দেখা গেল অতিক্ষুদ্র কণার জগতে অবস্থান ও ভরবেগ আমরা একই সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারছি না। এই ঘটনা থেকে কোন কোন দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কণাজগত এবং সেই অর্থে প্রকৃতিকে তার স্বরূপে আমরা জানতে পারি না। তাঁরা পদার্থবিদ্যাকে এমনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যে প্রকৃতির স্বরূপকে প্রায় অজ্ঞেয় জগতের বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। আমরা এখানে অজানার কথা বলছি না। সে তো সর্বদাই বিজ্ঞানে বিদ্যমান ছিল, থাকে এবং থাকবে। বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস হলো অজানা থেকে জানা, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু গুরুতর সমস্যা এসে উপস্থিত হয় যখন কেউ 'অজানা'-কে 'জ্ঞানাতীত'-এর সাথে গুলিয়ে ফেলেন–বলেন যে, জানার অতীত। আমরা জানতে পারি না। 'আমরা জানি না' এবং 'আমরা জানতে পারি না' শব্দবন্ধ দুইটির অর্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞান যে মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে তা হলো যে বস্তুময় বিশ্ব বিদ্যমান এবং সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বা জানা সম্ভব।

হেগেলের আবির্ভাব এবং ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ

যাই হোক, আমরা অভিজ্ঞতাবাদের যে দূর্বলতার কথা আলোচনা করছিলাম সেই পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উইলহেলম ফ্রেডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) এসে নতুন পথ দেখালেন। হেগেল দেখিয়েছিলেন যে, কান্ট যেসমস্ত 'অ্যান্টিনোমিস'-এর কারণে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বস্তুজগতকে তার স্বরূপে জানা সম্ভব নয়, এবং যা তিনি ভাবছেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা স্ব-বিরোধী, প্রকৃতপক্ষে সেই দ্বন্দ্বগুলি বাস্তবেই বিদ্যমান। কেবল চিন্তাতেই নয়, বাস্তব জগতেও। প্রকৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হতে হেগেল দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতির জন্ম দিলেন। বলা চলে তিনি নতুন করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কারণ, প্রাচীনকালেও খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশত বছর আগে থেকে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত তৎকালীন যুক্তিশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে দ্বান্দ্বিক চিন্তা-পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা আগেই বলেছি মধ্যযুগে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব অ্যারিস্টটলের ফর্মাল লজিককে একটা প্রাণহীন এবং অনমনীয় মতবাদে পরিণত করেছিল। বলা যেতে পারে কান্ট এসে এই অচলায়তনকে ভেঙে দেন। যদিও কান্টও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিকাশে বেশিদূর যাননি। দ্বান্দ্বিক চিন্তার বিজ্ঞান তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় হেগেলের হাতে পড়ে। হেগেলের অন্যতম মহত্ত্ব এই যে, তিনি একাই সেই সময়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী যান্ত্রিক দর্শনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্বান্দ্বিক দর্শনকে উপস্থিত করেন। এই পদ্ধতি বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ করার একটি চমকপ্রদ আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক উপায়। আজ এই কথা স্বীকৃত যে, প্রকৃতপক্ষে অনেক দিক থেকে হেগেল তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তবুও, তাঁর অসম্ভব উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও, হেগেলের দর্শন শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদী

থাকতে পারেনি। এর প্রধান ত্রুটি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে হেগেলের ভাববাদী সিদ্ধান্ত। এই ত্রুটি তাঁকে সর্বাংশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাস্তব জগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধা দেয়। তাঁর সামনে যখন প্রশ্ন এলো যে–না হয় বুঝা গেল বস্তুজগৎ দ্বন্দ্বময়, কিন্তু এই বস্তু বা প্রকৃতি এলো কোথা থেকে? তার উৎস কি? তার উত্তরে হেগেল এক পরম চেতনার (absolute idea) কথা বললেন আর তার সাথে বললেন যে প্রকৃতি সেই পরম চেতনা থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে যাওয়া রূপ। প্রকৃতি সেখান থেকে উৎপন্ন। দর্শন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল এবং হেগেল সেই সম্পর্কে কি বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন–'আমরা কি বাস্তব জগত সম্পর্কে আমাদের ধারণায় ও বিশ্বাসে বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন প্রকাশ করতে সক্ষম? দার্শনিক ভাষায় এই প্রশ্নটিকে চিন্তা ও সত্তার পরিচয়ের (identity of thinking and being) প্রশ্ন বলা হয় এবং দার্শনিকদের সিংহভাগই এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন। যেমন হেগেলেই, উদাহরণস্বরূপ, এ কথার সুনিশ্চিত স্বীকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে আছে : বাস্তব জগতে আমরা যা দেখি তা অবিকল চৈতন্যের রূপ-যা বিশ্বকে পরম ধারণার যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে রূপ দিয়েছে, যে পরম ধারণাটি অনন্তকাল থেকে কোথাও না কোথাও বিদ্যমান ছিল, বিশ্ব-নিরপেক্ষভাবে এবং বিশ্বের আগেই যার অস্তিত্ব ছিল।' (এঙ্গেলস, ১৮৮৬, পৃ-৩৬৭) অর্থাৎ, হেগেল শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, পরম চেতনাই প্রাথমিক। আর এখানেই হেগেল হয়ে পড়েন ভাববাদী। এই কারণেই এঙ্গেলস বলেছেন যে, হেগেলের দর্শন অনুযায়ী প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র চেতনার অনুকম্পার উপর নির্ভর করে।

হেগেলের ভাববাদী ধারণার বিরোধিতা করে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাথে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন হেগেলেরই শিষ্য ফুয়েরবাখ। ফুয়েরবাখের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রভাবিত করেছিল তরুণ মার্কস, এঙ্গেলসসহ তৎকালীন সমস্ত নব্য হেগেলিয়ানদের, যদিও ফুয়েরবাখও শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদী থাকতে পারেননি। মার্কসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে এই প্রসঙ্গে আমরা যা বলেছিলাম তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেখানে আছে–'ফুয়েরবাখ হেগেলের সমালোচনা করে প্রকৃতি থেকেই যে সকল কিছুর সৃষ্টি তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনকে স্বীকার করেও শেষ বিচারে ভাববাদের প্রভাব থেকে নিজের দর্শন-চিন্তাকে মুক্ত করতে পারেননি। তাঁর দর্শনে ভাববাদী প্রকাশ ধরা যায় তখনই, যখন তিনি ধর্ম ও নৈতিকতার দর্শন আলোচনা করেছেন। তিনি ধর্মের বিনাশ চাননি, তিনি ধর্মকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন এমন এক ধর্ম যার ভিত্তিতে ঈশ্বর থাকবে না, থাকবে বস্তুবাদ। এঙ্গেলস পরিহাস করে বলেছেন যে, এটা যেন অনেকটা সেইরকম যখন আলকেমিস্ট থাকবে কিন্তু স্পর্শমণি থাকবে না (If religion can exist without its god, alchemy can exist without its philosopher's stone)। তাঁর সেই নতুন ধর্মে তিনি এমন এক বিমূর্ত মানুষের কল্পনা করলেন যার নৈতিকতা, আচরণ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ইত্যাদি সকলের জন্য, সকল সময় এবং সকল অবস্থায় প্রযোজ্য, অর্থাৎ বস্তুগত অবস্থার বিকাশ বা সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক ধারার

সাথে সেই সুনীতি (morality) বা নৈতিকতার (ethics) আর কোন সম্পর্ক থাকল না। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত এক ভাববাদী শাশ্বত ধারণার তিনি জন্ম দিলেন। না হলে তিনি খুব সুন্দর করেই বলেছিলেন যে, 'মানুষ যখন প্রকৃতি থেকে জন্ম নিয়েছিল, তখন সে কেবলমাত্র প্রকৃতি-সৃষ্ট এক প্রাণীই ছিল, মানুষ ছিল না। মানুষ মানুষের সৃষ্টি, সংস্কৃতির সৃষ্টি, ইতিহাসের সৃষ্টি।' (Man as he sprang originally from nature was only a mere creature of nature, not a man. Man is a product of man, of culture, of history)। এই কথা উল্লেখ করে এঙ্গেলস বলেছেন যে, এমন সুন্দর কথাও বন্ধ্যা হয়ে গেল-this dictum remains absolutely sterile। কারণ, এই কথা বলার পরও ফুয়েরবাখের মনে হয়নি যে, নৈতিক বোধের নিরিখে যা কিছু পাপ, অশুভ, মন্দ, অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়গুলোর ইতিহাসের সাপেক্ষে বিচার করা প্রয়োজন। সময়ের সাথে সমাজ বাস্তবতার পরিবর্তনের সাথে এই ধারণাগুলোর পরিবর্তন ঘটে।

দর্শনের বিকাশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়, হেগেল-ফুয়েরবাখের পরে, মার্কস এবং এঙ্গেলসই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে দাঁড় করান এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতি, সমাজ এবং মানব চিন্তার কাজ বুঝার জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে অভিজ্ঞতাবাদ, প্রত্যক্ষবাদের সীমাবদ্ধতা বা দূর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে এবং দূর করে মার্কসীয় দর্শন আসার এই হলো সুদীর্ঘ ইতিহাস।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন

মার্কসবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত রয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন। মার্কস চেয়েছিলেন নির্দিষ্টভাবে এই দর্শনের উপরই একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ লেখা লিখতে। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল ক্যাপিটাল লেখার জন্য প্রস্তুতি কর্মে। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিশ্ব-ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সর্বশেষ গবেষণা পাঠ করতে। বিপুল পরিশ্রম করেছেন তিনি পুঁজির বিকাশের ঐতিহাসিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে। তার সাথে ছিল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন। সেই কারণে, দুর্ভাগ্যবশত তেমন বিস্তৃতাকারে মার্কসের পক্ষে এই বিষয়ে একটি বই লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশ্য, এই বিষয়ের উপর মার্কসের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রথমদিকে এঙ্গেলসের সাথে যৌথ কাজগুলি বিবেচনা করতে পারি-যেমন *দ্য হোলি ফ্যামিলি* এবং *দ্য জার্মান আইডিওলজি*। তবে, ঘটনা হলো সেগুলি একটি নতুন দর্শন বিকাশের প্রস্তুতিমূলক প্রয়াসপর্বের কাজ। আবার, আমরা যদি মার্কসের লেখা পুঁজির তিনটি খণ্ড বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে, তা হলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিশেষ বা কংক্রিট প্রয়োগের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। এর বাইরে মার্কসবাদী দর্শন বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার প্রধান কাজগুলি করেছেন এঙ্গেলস। *অ্যান্টি-ডুরিং*, *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* এবং *লুডউইগ ফুয়েরবাখ এবং ক্লাসিক্যাল জার্মান দর্শনের অবসান*–

এই তিনটি বইতে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা এঙ্গেলস উপস্থিত করেছেন। এই কারণে সকলের কাছে এই তিনটি বইয়ের পাঠ অপরিহার্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বস্তুবাদী দর্শন মানেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নয়। মার্কসের আগেই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নিউটনীয় বলবিদ্যাকে ভিত্তি করে যে বস্তুবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল তা ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদ। তার আগে থ্যালেস থেকে শুরু করে ছিল অভিজ্ঞতাবাদী বস্তুবাদ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যান্ত্রিক বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার বস্তুগত পরিস্থিতি তৈরি হয়। মার্কসবাদী দর্শন আলোচনায় এই দুইই আমাদের ভালোভাবে বুঝার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের খুব প্রাঞ্জল লেখা আছে :

'গত শতাব্দীর (অর্থাৎ অষ্টাদশ) বস্তুবাদ প্রধানত যান্ত্রিক ছিল, কারণ সেই সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে কেবলমাত্র বলবিদ্যা, এবং তাও প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র কঠিন বস্তুর বলবিদ্যা–মহাজাগতিক ও সৌরমণ্ডলীয়-সংক্ষেপে, মাধ্যাকর্ষীয় বলবিদ্যা, শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট সম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের সবেমাত্র শৈশবাস্থা, যা ফ্লোজিস্টিক[৩] আকারে বিদ্যমান ছিল। জীববিজ্ঞান তখনও জন্মের পর যে কাপড় দিয়ে নবজাতককে মুড়ে রাখা হয় তার মধ্যে শুয়ে আছে; উদ্ভিজ্জ এবং জীবজগতের প্রাণীদের কেবল মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করা শুরু হয়েছিল এবং তাদের ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে। দেকার্তের কাছে যা ছিল প্রাণী, অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদীদের কাছে মানুষ ছিল তেমনই একটি যন্ত্র মাত্র। রাসায়নিক এবং জৈব প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বলবিদ্যার মানদণ্ডগুলির এইভাবে একচেটিয়া প্রয়োগ ছিল সেই সময়ের ক্লাসিক্যাল ফরাসি বস্তুবাদের প্রথম সুনির্দিষ্ট এবং অনিবার্য সীমাবদ্ধতা-যদিও রাসায়নিক এবং জৈব প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে বলবিদ্যার নিয়মগুলোও যথার্থই বৈধ, তবে অন্যান্য নিয়ম বা উচ্চতর নিয়মগুলি তাদের পশ্চাতভূমিতে ঠেলে দেয়।'

'বস্তু যে নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মহাবিশ্বকে তেমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বুঝার অক্ষমতার মধ্যে এই বস্তুবাদের দ্বিতীয় সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নিহিত ছিল। সেই সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে স্তরে ছিল এবং সেই স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বান্দ্বিকতা-বিরোধী দার্শনিকতা যে আধিভৌতিক পদ্ধতি মেনে চলত তার সাথে এই অক্ষমতার সম্পর্ক ছিল। যা জানা ছিল তাহলো প্রকৃতি অবিরাম গতির মধ্যে আছে। কিন্তু সেই সময়ের ধারণা অনুসারে, এই গতিটিও চিরন্তনভাবে একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে, বারংবার একই ফলাফল ঘুরে ঘুরে আসে। এই ধারণাটি তখন অনিবার্য ছিল। সৌরজগতের উৎপত্তির কান্টিয়ান তত্ত্ব [যে সূর্য এবং গ্রহগুলি ভাস্বর ও ঘূর্ণায়মান নীবুলাস ভর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল] সামনে রাখা হলেও সেটাকে সেই সময়

৩. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রসায়নে প্রচলিত তত্ত্ব ছিল যে ফ্লোজিস্টন নামে একটি বিশেষ পদার্থের নির্দিষ্ট দেহে উপস্থিতির কারণে দহন ঘটে।

নিছক কৌতূহলের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি তখনও সম্পূর্ণ অজানা ছিল। আজকের সজীব প্রাকৃতিক প্রাণীগুলি যে বিকাশের দীর্ঘ ক্রমানুসারের ফলস্বরূপ সরল থেকে জটিল হয়েছে সেই জ্ঞান সেই সময়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হিসাবে উপস্থিত ছিল না। প্রকৃতি সম্পর্কে অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তাই অনিবার্য ছিল। যদিও অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকদের তার জন্য তিরস্কার করার কারণ নেই, কেননা হেগেলের মধ্যে একই জিনিস পাওয়া যায়। তাঁর মতে, প্রকৃতি হলো "চেতনা" (বা "ভাব") থেকে নিছক "বিচ্ছিন্নতা" এবং কালের (time) সাথে বিকশিত হওয়ার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই। প্রকৃতি কেবলমাত্র "স্থান" (space)-এ বহুগুণ প্রসারিত হতে সক্ষম। সেটা এই কারণে যে, প্রকৃতির মাঝে বিকাশের যে বিভিন্ন স্তর আছে সেগুলোকে যাতে একই সাথে এবং একটিকে অপরের পাশাপাশি প্রদর্শন করতে পারে। কারণ, প্রকৃতি প্রক্রিয়াগুলি একইভাবে চিরন্তন পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। বিকাশ ঘটে শুধুমাত্র স্থানে (space) কিন্তু কালের (time) নিরিখে নয়-সমস্ত বিকাশের মৌলিক শর্ত হিসাবে এই অযৌক্তিকতা হেগেল প্রকৃতির উপর চাপিয়েছেন ঠিক সেই সময়ে যখন ভূতত্ত্ব, ভ্রূণবিদ্যা, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহতত্ত্ব এবং জৈব রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি সবেমাত্র তৈরি হচ্ছিল, এবং যখন সর্বত্র এই নতুন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরবর্তী তত্ত্ব বিবর্তনবাদের উজ্জ্বল পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছিল (উদাহরণস্বরূপ, গোয়েথে এবং ল্যামার্ক)। কিন্তু প্রাকৃতিক ধর্ম ঐটাই দাবি করছিল; তাই প্রকৃতির অনুসারিত নিয়মের কারণেই বিচারপদ্ধতি নিজের কাছে নিজেই অসত্য হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছিল।'

... 'ফিজিওলজি, যা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জৈবদেহের মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে গবেষণা করে; ভ্রূণবিদ্যা, যা প্রতিটি পৃথক জীবের ভ্রূণাবস্থা থেকে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত বিকাশ নিয়ে কাজ করে; ভূতত্ত্ব, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের ক্রমান্বয়িক গঠন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে - এগুলি আমাদের শতাব্দীতে জন্ম নিয়েছে।

তবে, সর্বোপরি, তিনটি দুর্দান্ত আবিষ্কার যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে চমকপ্রদভাবে এক লাফে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছে :

প্রথমত, একটি একক কোষের আবিষ্কার যার সংখ্যাবৃদ্ধি ও পৃথকীকরণের মাধ্যমে সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিকাশ ঘটেছে। সমস্ত উচ্চতর জীবের বিকাশ এবং বৃদ্ধি একটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঘটেছে শুধুমাত্র এইটুকু বুঝার স্বীকৃতি নয়, কোষের পরিবর্তনের ক্ষমতা নির্দেশ করে যে, কীভাবে জীবগুলি তাদের প্রজাতি পরিবর্তন করতে পারে এবং এইভাবে কোষের নিজের স্বতন্ত্র বিকাশের চেয়েও অধিকতর কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শক্তির রূপান্তর, যা আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, যে সমস্ত তথাকথিত শক্তি প্রথম দৃষ্টান্তে অজৈব জগতে কাজ করে–যান্ত্রিক বল এবং এর পরিপূরক, তথাকথিত বিভব শক্তি, তাপ, বিকিরণ (আলো বা বিকীর্ণ তাপ), বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব এবং রাসায়নিক শক্তি–এইগুলো সব সার্বজনীন গতির প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-যা

নির্দিষ্ট অনুপাতে একে অপরে রূপান্তরিত হয়। যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তি অন্তর্হিত হয় তখন সেই জায়গায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভিন্ন একটি শক্তি আবির্ভূত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির সমগ্র শক্তি (motion)[৪] আসলে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরের এক অবিরাম প্রক্রিয়া।

সবশেষে, ডারউইন যে প্রমাণটি প্রথম সুসংবদ্ধ আকারে উপস্থিত করেছিলেন যে, মানুষসহ প্রকৃতির সৃষ্ট সকল জৈব বস্তু-যা আজ আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে-সব কয়েকটি মূল এককোষী জীবাণু থেকে বিবর্তনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল এবং এগুলি আবার প্রোটোপ্লাজম বা অ্যালবুমেন থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা সৃষ্টি হয়েছে রাসায়নিক উপায়ে।'

'এই তিনটি মহান আবিষ্কারের এবং তার সাথে সাথে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে আমরা এখন এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছি যেখানে প্রকৃতির প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই নয়, বরং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে সমগ্রের আন্তঃসংযোগকেও আমরা দেখাতে পারি বা প্রমাণ করতে পারি এবং সেই কারণে, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসংযোগের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সুসম্বদ্ধ আকারে উপস্থাপন করতে পারি। পূর্বে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করা তথাকথিত প্রাকৃতিক দর্শনের (natural philosophy) করণীয় কাজ ছিল। এই কাজ প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy) করত প্রকৃতিতে যে আন্তঃসম্পর্কগুলি বাস্তবে আছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তথ্য না থাকার কারণে তখনও অজানা, সেই অনুপস্থিত সত্যগুলির জায়গা প্রতিস্থাপিত করত আদর্শসদৃশ, কল্পনাপ্রসূত চিত্র দিয়ে এবং কেবল কল্পনার মাধ্যমে বাস্তব ফাঁকগুলি পূরণ করত। এই পদ্ধতি চলাকালীন সময়ে এটি অনেক উজ্জ্বল ধারণা (brilliant ideas) কল্পনা করেছে এবং পরবর্তী অনেক আবিষ্কারের পূর্বাভাসও দিয়েছে, তবে একই সাথে এটি যথেষ্ট পরিমাণে ছাইপাঁশেরও জন্ম দিয়েছে।'

'আজ আমাদের সময়ের জন্য সন্তোষজনক "প্রকৃতির গঠন-ব্যবস্থা" (system of nature) ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলগুলিকে যখন একজনের কেবলমাত্র দ্বান্দ্বিকভাবে, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব আন্তঃসম্পর্কের অর্থে, বুঝার প্রয়োজন হয়; যখন এই আন্তঃসম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি এমনকি আধিভৌতিক দর্শনে প্রশিক্ষিত (metaphysically-trained) প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মনের মধ্যেও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে জায়গা করে নিচ্ছে, তখন অবশেষে সেই প্রেক্ষিতে আজ "ন্যাচারাল ফিলসফি"-র প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে। এটিকে পুনরুত্থিত করার প্রতিটি প্রচেষ্টা কেবল অপ্রয়োজনীয় নয় বরং তা হবে এক ধাপ পিছনের দিকে যাওয়া।' (এঙ্গেলস, ১৮৮৬, পৃ- ৩৭০-৩৮৬)

৪. Words such as 'force,' 'motion,' and 'vis viva' were used where we should now speak of energy. - J B S Haldane in 'Engels' Dialectics of Nature', Preface

তাহলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতি বা 'প্রকৃতির গঠন-ব্যবস্থা' সম্পর্কে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা উঠে এসেছিল এবং বিজ্ঞানের যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছিল তার ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সন্তোষজনক, গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদ দিয়ে বা অ্যারিস্টটলের সময় থেকে চলে আসা আকৃতিগত যুক্তিশাস্ত্র (formal logic) মেনে সেই সব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মার্কসবাদ তাই আকাশ থেকে হঠাৎ করে আসেনি। প্রশ্নগুলো অনেক আগে থেকেই ছিল। লেনিন বলেছেন–'...মার্কসের প্রতিভার স্বাক্ষর নির্দিষ্টভাবে এটাই যে, মানব সমাজের অগ্রগণ্য ভাবনায় যে সমস্ত জিজ্ঞাসা ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছিল মার্কস তারই উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ধারাবাহিকতা হিসেবে।' (লেনিন, ১৯১৩, পৃ-২৩)।

মার্কসবাদকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলার কারণ প্রকৃতির প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতির ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অনুধাবন করার পদ্ধতিটি দ্বান্দ্বিক, আবার প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করা ঘটনার (phenomena of nature) ব্যাখ্যা, সেই ঘটনা সম্পর্কে ধারণা ও তার তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী। তাহলে, মার্কসবাদের পূর্বসূরী অন্যান্য দর্শন বা যুক্তিশাস্ত্র থেকে মার্কসবাদের মৌলিক পার্থক্য ঘটেছে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিক হওয়ার কারণে।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকে চলে আসা আকৃতিগত যুক্তিশাস্ত্রের দুর্বলতা এই যে, সে সবকিছুকেই অপরিবর্তনীয় হিসাবে বিচার করেছে। স্কুল-কলেজের যুক্তিশাস্ত্রের পাঠ্য বইতে আকৃতিগত যুক্তিশাস্ত্রের তিনটি সূত্র পাওয়া যায়। সেখানে এর কোনটার সাথেই গতির কোন ধারণাই নেই, সবকিছু গড়ে উঠেছে স্থিতি-কে ভিত্তি করে। প্রকৃতিতে আবার কোন কিছুই স্থির থাকার উপায় নেই, সর্বদা এবং সবকিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। একটা কাঁচা বেল চিরকাল কাঁচা থাকে না। সে পরিপক্ক হয়। আগুন জ্বালালে সে চিরকাল জ্বলতে থাকে না, এক সময় নেভে। গরম দুধ চিরকাল গরম থাকে না, ঠান্ডা হয়। অর্থাৎ কোন জিনিসকেই কোন স্থায়ী লক্ষণ দিয়ে চেনা যায় না, বুঝা যায় না। আপনারা লক্ষ্য করে থাকলে বুঝতে পারবেন যে ২০১৩ সালে আমাদের দল থেকে কতিপয় নেতাকর্মীর দলত্যাগের সময় তাদের পক্ষ থেকে যাঁরাই বিতর্ক করতে এসেছেন, যুক্তি করেছেন–তাদের উত্থাপিত যুক্তি ও যুক্তিধারা যদি আপনারা খেয়াল করেন, তবে দেখতে পাবেন তাদের সকলের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। তাদের বিবেচনায়, বোধে, যুক্তিতে, ভাবনায়, ইতিহাস বিচারে সবকিছুই স্থির (static) এবং খণ্ডিত। বিচ্ছিন্নভাবে একটা স্থায়ী লক্ষণ দিয়ে সব কিছু বিচার করার প্রচেষ্টা ছিল।

যাই হোক, আর বস্তুর এই যে পরিবর্তন বা বিকাশ, তা ঘটে প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলস্বরূপ, প্রকৃতিতে পরস্পর বিরোধী দুই শক্তির ফলাফল বা পরিণতি হিসাবে। এই কারণে, মার্কসবাদী দর্শনে বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূলকেন্দ্রে রয়েছে দ্বান্দ্বিকতা।

তাহলে আমাদের শুরু করতে হয় 'দ্বন্দ্ব' (dialectics) কী, 'দ্বান্দ্বিকতা' dialectical) কী, সেই আলোচনা দিয়েই।

দ্বান্দ্বিকতা কী?

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে স্ট্যালিনের আমলে বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য *A Text of Marxist Philosophy* শিরোনামে মার্কসীয় দর্শনের একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে শুরু হয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে–'What is Dialectic?'। তার উত্তরে বলা হয়েছিল যে, বস্তুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এবং বস্তুর বিকাশ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বস্তুকে জানাই হলো দ্বান্দ্বিক চিন্তা (Dialectical thought is the study of things in their relations and in process of development and change)। এর সাথে বলা হয়েছিল যে, দ্বান্দ্বিকতার বিপরীত হলো বস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং শুধুমাত্র অপরিবর্তনীয় রূপে বিবেচনা করা (The opposite of dialectics is the isolated consideration of things, and the consideration of things in fixity.).

স্ট্যালিন dialectics-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–'Dialectics (দ্বান্দ্বিকতা) এসেছে গ্রিক dialego থেকে, যার অর্থ আলোচনা করা, বিতর্ক করা। প্রাচীনকালে dialectics ছিল প্রতিপক্ষের যুক্তির মধ্যে যে বিরোধ তাকে উন্মোচিত করা এবং সেইগুলোর মীমাংসা করে সত্যে পৌঁছানোর নৈপুণ্য। প্রাচীনকালে এমন অনেক দার্শনিক ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চিন্তার মধ্যে বিরোধ উন্মোচন করা এবং পরস্পরবিরোধী মতের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানোই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। যুক্তিবিচারের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরে যখন প্রকৃতি জগতের ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয় তখন সেটাই প্রকৃতিকে অনুধাবন করার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হিসাবে বিকশিত হয়। যে কোন ঘটনা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মনে করে যে প্রকৃতির ঘটনা অবিরত গতিতে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং প্রকৃতি জগতের বিকাশ হলো প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরোধের পরিণতি, পরস্পরবিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলাফল।' (স্ট্যালিন, ১৯৩৯, পৃ-১০৬)[৫]

দ্বান্দ্বিকতা বা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো যে কোন ঘটনাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, যেমনটা আধিভৌতিক পদ্ধতি (metaphysics) অনুযায়ী করা হয়। দ্বান্দ্বিকতা মনে করে না যে, প্রকৃতিতে বস্তুজগত হলো একে অপরের সাথে সংযোগহীন, একে অপরের থেকে স্বাধীন এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন কতগুলো বস্তুর বা ঘটনার দুর্ঘটনাজনিত সমষ্টি। বরং প্রকৃতিকে বস্তুর সংযুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য এক সমগ্র হিসাবে দেখে, যেখানে কোন বস্তু হোক বা

৫ . স্ট্যালিনের *'ডায়ালেকটিক্যাল অ্যান্ড হিসটোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম'* লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে, কিন্তু সেটা তাঁর রচনাবলিতে নেই, তার পরিবর্তে এটি বলশেভিক পার্টির ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রচনাবলির চতুর্দশ খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কোন ঘটনা (phenomenon) হোক অন্যান্য ঘটনা বা বস্তুর সাথে পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের দ্বারা নির্ধারিত। এই কারণে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মনে করে যে, প্রকৃতির কোনো ঘটনাই বুঝা যাবে না যদি পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা হয়।

এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিকতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন 'প্রকৃতি, সমাজ এবং মানুষের চিন্তার সবচেয়ে সাধারণ গতিসূত্র' (the most general laws of motion of nature, society, and human thought)। *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* বইতে এঙ্গেলস সেই সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পর্যন্ত অগ্রগতি ঘটেছিল সেইগুলো অধ্যয়ন করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, শেষ বিচারে প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে তার চরিত্র দ্বান্দ্বিক ('in the last analysis, the workings of nature are dialectical.')। তিনি প্রায় দশ বছর ধরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করে কিছু নোট রেখেছিলেন, কোন কোন প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখেছিলেন, কোন কোন বিষয়ে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বুঝার জন্য আরো গভীরতর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান প্রয়োজন হবে সেইগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন। *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* বইটি হলো সেই নোটবই। মার্কসের মৃত্যু হলে ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করার কাজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি এই নোট বইকে পূর্ণাঙ্গ বই হিসাবে লেখার আর সময় পাননি। আবার, বিজ্ঞানও আজ আর সেই জায়গায় নেই। সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানের সবেমাত্র যাত্রা শুরু হয়েছিল। এমনকি কোন কোন বৈজ্ঞানিক ধারণাকে বুঝাতে সেই সময় যে পরিভাষা ব্যবহার করা হতো বিজ্ঞানে আজ তা করা হয় না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারণাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পরিভাষাও পাল্টেছে। কিন্তু তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ থেকেই, তাঁর সেই টুকরো টুকরো মন্তব্য থেকেই, তিনি যে কথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সেটি যে সত্য, অর্থাৎ শেষ বিচারে প্রকৃতির কার্যকলাপ দ্বান্দ্বিক ('in the last analysis, the workings of nature are dialectical') তা অনুধাবনে কোন অসুবিধা হয় না।

তাহলে আমরা জানলাম যে, দ্বান্দ্বিকতা হলো প্রকৃতি এবং সমাজ উভয় জগত সম্পর্কে চিন্তা করার ও তাদের ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি। বলা যেতে পারে এটি প্রকৃতি বা মহাবিশ্বকে দেখার একটি উপায় বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসবাদের দার্শনিক অবস্থান এই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট যে, প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি জগতকে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে কোন অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হলো অবৈজ্ঞানিক এবং সেই কারণেই মার্কসবাদ সমস্ত ধরনের ভাববাদী চিন্তার বিরুদ্ধে যারা বিশ্বজগতের ব্যাখ্যায় অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। এই দর্শন বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে প্রথমেই প্রকৃতিজগতের একটি ধ্রুবসত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাহলো এই যে, জগতের সকল কিছু বস্তুময় ও বস্তুগত এবং প্রকৃতিতে বা বাস্তব জগতে এমন কিছু নেই যা বস্তুসম্ভূত নয়। আর বস্তুর নিয়মই হলো নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলা।

কোন কিছুই স্থির নয়, অপরিবর্তনশীল নয়। তবে শুধু সেইটুকুই নয়। দ্বান্দ্বিকতা ব্যাখ্যা করে যে বস্তুর পরিবর্তন এবং গতির মূলে আছে দ্বন্দ্ব এবং শুধুমাত্র দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই বা 'law of dialectics' মেনেই বস্তুর পরিবর্তন হয় বা অগ্রগতি ঘটে। এই কারণেই আমরা বলি-Dialectics is the logic of contradiction–দ্বান্দ্বিকতা হল দ্বন্দ্বের বা বিরোধের যুক্তিশাস্ত্র।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের (Dialectics) তিনটি সূত্র

মার্কস দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি সূত্র পেয়েছিলেন হেগেলের কাছ থেকে, কিন্তু হেগেলের চিন্তার ভাববাদী বুনিয়াদ থেকে তাকে মুক্ত করে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কস নিজেই বলেছেন–'আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু যে ভিন্ন তাই নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত।' হেগেলের কাছে 'চেতনা'-যাকে তিনি 'Idea' বলে অভিহিত করেছিলেন-তাই বাস্তব জগতের স্রষ্টা (demirurgos, creator)। বলেছেন বাস্তব জগৎ 'আইডিয়া'-র বাহ্যিক প্রকাশ ('phenomenal form') মাত্র। *ডায়ালেকটিকস অব নেচার*-এ এঙ্গেলস বলেছেন-'...যদি আমরা বিষয়টিকে ঘুরিয়ে দেখি, তাহলে সবকিছুই সহজ হয়ে যায় এবং ভাববাদী দর্শনে যে দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলি এতটা রহস্যময় দেখায়, তা দিনের আলোর মতো সহজ এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে।' অর্থাৎ, বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন হেগেলের সূত্রকে মার্কস বস্তুজগতের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। চেতনা থেকে বস্তু সৃষ্টির হেগেলের তত্ত্বকে তিনি দাঁড় করালেন বস্তু থেকে চেতনার সৃষ্টি তত্ত্বে। মার্কস যে বলেছিলেন, হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব মাথা নিচে পা উপরে করে শীর্ষাসনে ছিল, তিনি তাকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন–এটাই তার সারমর্ম।

আমরা আগেই বলেছি যে, আকৃতিগত যুক্তিশাস্ত্র বা অধিবিদ্যার ঠিক বিপরীতে মার্কসবাদ মনে করে যে, বস্তুজগত সর্বদাই পরিবর্তনশীল। *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* বইতে এঙ্গেলস বলেছেন–'ব্যাপক অর্থে গতি হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের উপায়। গতি হলো বস্তুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া সমস্ত পরিবর্তন এবং প্রক্রিয়াগুলি-মামুলি স্থান পরিবর্তন থেকে শুরু করে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত-বলতে বুঝায় গতি। গতির চরিত্রের তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্যই এই গতির সর্বনিম্ন ও সহজতম রূপ থেকে শুরু করতে হবে এবং উচ্চতর ও আরও জটিল রূপগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কিছু অর্জন করতে চাই তবে তার আগে এগুলিকে শিখতে হবে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩৬২) ... 'অনন্তকাল ধরে সমগ্র প্রকৃতির অস্তিত্ব হলো-এর ক্ষুদ্রতম জিনিস থেকে বিরাটাকারের জিনিস পর্যন্ত, বালির কণা থেকে সূর্য, প্রোটিস্টা (প্রাথমিক জীবিত কোষ) থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলের-সত্তা রূপে আসা এবং সত্তার অস্তিত্বের বাইরে চলে যাওয়ার অবিরাম গতি এবং পরিবর্তনের এক বিরতিহীন প্রবাহ।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩২৭)

একেবারে হাল আমলের বিশ্ববিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ডেভিড বম তাঁর *ক্যজালিটি অ্যান্ড চান্স* বইটিতে প্রকৃতি বা বস্তুজগতের স্বরূপের যে ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছেন তাও বস্তু ও গতি সম্পর্কে এঙ্গেলসের কথারই প্রতিধ্বনি :

'প্রকৃতিতে কোন কিছুই স্থির থাকে না। রূপান্তর, গতি এবং পরিবর্তনের এক চিরস্থায়ী অবস্থার মধ্যে সবকিছু রয়েছে। যাইহোক, আমরা আবিষ্কার করেছি যে, কোন কিছুই কেবলমাত্র এমন অবস্থা থেকে উঠে আসে না যার কোন পূর্বসূরি বিদ্যমান ছিল না। একইভাবে, এমনভাবে কোন কিছুই কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয় না, যার থেকে পরবর্তী সময়ে চূড়ান্তভাবে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই এমন কোন ধারণার জন্ম হতে পারে । বিশ্বের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি এমন একটি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা যেতে পারে, যা একটি বিশাল ক্ষেত্রজুড়ে (enormous domain) বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সাধারণ সত্যকে প্রকাশ করে এবং যা এখনও পর্যন্ত কোনও পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষায়-বৈজ্ঞানিক হোক বা অন্যরকম-নাকচ করা যায়নি, সেই নীতিটি হলো-সবকিছু অন্য বস্তু থেকে আসে এবং অন্য বস্তুর জন্ম দেয় (everything comes from other things and gives rise to other things)।'[৬] (বম, ১৯৫৭ পৃ-১)

স্বাভাবিকভাবেই এরপরেই যে প্রশ্ন আসে তা হলো প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন তার কী কোন সাধারণ নিয়ম আছে? দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি সূত্র পরিবর্তনের সেই সাধারণ নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করে। আমরা এঙ্গেলসের *ডায়ালেকটিকস অব নেচার* বই থেকে এই সূত্রগুলো ব্যাখ্যাসহ জেনে নেই।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রথম সূত্র : পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং তৎ বিপরীত (The law of the transformation of quantity into quality and vice versa)

প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি। খুব সহজ ভাবে বুঝানোর জন্য সবাই–এঙ্গেলস, স্ট্যালিন, মাও–আমাদের চোখে দেখা নিত্যদিনের উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা এখানে পরপর বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেখব যা এঙ্গেলস ব্যবহার করেছেন দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। আবার, এমন উদাহরণ দেখব যখন মার্কস *দাস ক্যাপিটাল*-এ তাঁর বিশ্লেষণে এই দ্বান্দ্বিক সূত্রের সাহায্যে বিষয়কে ব্যাখ্যা করছেন।

আমরা জানি পদার্থের তিন অবস্থা–কঠিন (solid), তরল (liquid) এবং গ্যাসিয় (gas)। এখন, আমরা যদি এক খণ্ড বরফ নেই, বরফ হলো কঠিন অবস্থা এবং তাপ দিতে থাকি, তবে ধীরে ধীরে বরফের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং একসময় কঠিন বরফ তরলে পরিণত হবে। অর্থাৎ, তাপের পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে একসময় বরফ কঠিন অবস্থা থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন তরল অবস্থায় পরিণত হলো। আমরা যদি আরও তাপ দিতেই থাকি তাহলে তরল পানির উষ্ণতার পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে এবং একসময় বাস্পীভবনের মাধ্যমে গ্যাসিয় অবস্থায় যাবে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, এই পরিবর্তন কিন্তু একরৈখিক না, কোন কোন জায়গায় ছেদ আছে সেখানে

৬ . বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ দ্য ব্রগলির ভূমিকাসহ নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে ডেভিড বমের মৃত্যুর পর ১৯৯৭ সালে এই বইটির ঐ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। তবে বর্তমান উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে ২০০৫ সালের টেইলার অ্যান্ড ফ্রান্সিসের সংস্করণ থেকে।

পরিবর্তনের উল্লম্ফন ঘটে। হঠাৎ করে কঠিন থেকে তরল আবার তরল থেকে গ্যাসিয় অবস্থায় যায়।

পদার্থবিজ্ঞানে প্রতিটি পরিবর্তন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত রূপান্তর। যা একটি বস্তুর অন্তর্নিহিত হোক বা বাইরে থেকে প্রদান করা হোক, কোন একটা কিছুর পরিমাণগত পরিবর্তনের ফল (is inherent in the body or communicated to it)। যেমন, একটি প্ল্যাটিনাম তারের মধ্য দিয়ে যদি বিদ্যুৎ পাঠানো হয় তবে উত্তপ্ত হয়ে তার থেকে আভা বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু এই আভা তৈরি করতে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি কঠিনাবস্থায় থাকা ধাতুকে উত্তপ্ত করতে থাকলে তা গলে যায়। কিন্তু তারজন্য একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রয়েছে, তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যেখানে পৌঁছালেই একমাত্র সেই ধাতু গলে যায়। অর্থাৎ ধাতুর কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তর ঘটে। প্রতিটি তরলেরই একটি নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে। যদি প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের হাতে উপায় থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট চাপে তরল অবস্থার পরিবর্তন করে তাকে কঠিন অবস্থায় অথবা গ্যাসিয় অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারি। আবার, গ্যাসিয় অবস্থা থেকেও তরল অবস্থাতে রূপান্তরিত করা যায়। প্রতিটি গ্যাসেরই একটি সংকট বিন্দু রয়েছে যখন সঠিক চাপ এবং শীতলীকরণের মাধ্যমে তাকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। এসব প্রক্রিয়ায়, পদার্থবিজ্ঞানে যা স্থিতিশীল বা ধ্রুবক হিসাবে পরিচিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই স্থির অবস্থা দিয়ে যা বুঝানো হয়েছে তা একটি নোডাল বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ যে বিন্দুতে পরিমাণগত পরিবর্তন (বৃদ্ধি হতে পারে বা হ্রাস হতে পারে) প্রদত্ত বস্তুর অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটায় এবং যার ফলে, পরিমাণ থেকে গুণগত রূপান্তর ঘটে। (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ- ৩৫৯)

আণবিক গতির গড় গতিশক্তির পরিমাণগত পরিবর্তন পদার্থের বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই গুণগত পরিবর্তনগুলি সাধারণত তাপমাত্রা একটি সংকট বিন্দুর কাছে যাওয়ার সাথে সাথে পূর্বাভাসিত হয়। কোন পদার্থ যখন সংকট তাপমাত্রা অতিক্রম করে, তখন দুটি জিনিস ঘটে। প্রথমত, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলি সৃষ্টি হয় (যেমন, তরল পর্যায়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট আয়তন দখল করার প্রবণতা)। দ্বিতীয়ত, এমনকি আপেক্ষিক তাপ, ঘনত্ব, ইত্যাদির মতো সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোও–যেগুলো রূপান্তরের আগের এবং পরের উভয় পর্যায়েই সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে–রূপান্তর বিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পরিমাণগত পরিবর্তন রেখাতেও ছেদ (discontinuity) দেখা যায়।

পরমাণু বোমার উদাহরণ নেওয়া যাক। ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে পরমাণু বোমা বানানোর জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, সেটি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সূত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটে তখনই যখন ইউরেনিয়ামের ভর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছায়। এই বিন্দুকে বলে সংকট ভর

(critical mass)। যতক্ষণ পর্যন্ত ইউরেনিয়ামের ভর এই সংকট বিন্দুর নিচে থাকে, ততক্ষণ সেটি বিস্ফোরিত হয় না। যা করা হয় তা হলো সাবক্রিটিকাল ভরের কয়েকটি ইউরেনিয়ামের টুকরো নেওয়া হয়। এদের প্রত্যেকের ভর সেই সংকট বিন্দুর নিচে কিন্তু তাদের সম্মিলিত ভর সেই সংকট ভরের সমান বা বেশি। এবার তাদেরকে একসাথে আঘাত করা হয়, যাতে তাদের সম্মিলিত ভর ক্রিটিক্যাল ভরকে ছাড়িয়ে যায়, একমাত্র তখনই তা বিস্ফোরণযোগ্য হয় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এখানেও গুণগতভাবে পৃথক অবস্থা, অর্থাৎ বিস্ফোরণযোগ্য অবস্থা, পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে অর্জন করতে হচ্ছে।

এঙ্গেলস *ডায়ালেকটিকস অব নেচার*-এ রসায়ন শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। ২টি নাইট্রোজেন (N) পরমাণুর সাথে ১টি অক্সিজেন (O) পরমাণু মিলিত হয়ে গঠিত হয় নাইট্রোজেন মনো-অক্সাইড (N_2O)। এটি একটি গ্যাস। এবার যদি ২টি নাইট্রোজেন পরমাণু ঠিক থাকল, কিন্তু তার সাথে ১টি অক্সিজেনের পরমাণুর পরিবর্তে যদি ৫টি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয় তবে তারা গঠন করবে নাইট্রোজেন পেন্টা-অক্সাইড (N_2O_5)। এটি কঠিন কেলাসিত পদার্থ। তাহলে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যার পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে গুণগতভাবে ভিন্ন নতুন পদার্থ তৈরি হলো। তেমনি, আমরা দেখি ১টি কার্বন (C) পরমাণু ও ৪টি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু মিলে গঠিত হয় মিথেন (CH_4)। এইবার যদি কার্বন পরমাণু ১ থেকে বেড়ে ২ হয়, আর হাইড্রোজেন পরমাণু ৪ থেকে বেড়ে ৬ হয়, তবে হয়ে যাবে ইথেন (C_2H_6)। যদি এইভাবে বাড়িয়ে যেতে থাকি, অর্থাৎ আগেরটার সাথে ১টা কার্বন পরমাণু আর ২টা হাইড্রোজেন পরমাণু (CH_2) ক্রমান্বয়ে যুক্ত করতে থাকি, তবে প্রতিবারই প্রোপেন (C_3H_8), বুটেন (C_4H_{10}) ইত্যাদি নতুন নতুন যৌগ তৈরি হতে থাকবে যাদের একের সাথে অন্যের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের বিচারে মৌলিক পার্থক্য আছে।

১৮৬৯ সালে দিমিত্রি মেন্ডেলিয়েভ বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ক্রম পরিবর্তন দেখানোর জন্য প্রকাশ করেছিলেন পর্যায় সারণি। সেই আবিষ্কারকে এঙ্গেলস পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে লেখেন : 'মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ওজনের সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এবং তাই, তাদের গুণমান তাদের পারমাণবিক ওজনের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি দুর্দান্তভাবে পরখ করা হয়েছে। মেন্ডেলিয়েভ প্রমাণ করেছিলেন যে, পারমাণবিক ওজন অনুসারে সাজানো উপাদানগুলির পর্যায় সারণিতে কতকগুলো জায়গায় ফাঁকা থাকছে। এই ঘটনা যৌক্তিকভাবে এটাই নির্দেশ করে যে, এখানে নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হতে বাকি রয়েছে। তিনি এই অজানা উপাদানগুলির মধ্যে একটির সাধারণ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আগে থেকে বর্ণনা করেছিলেন, যাকে তিনি ইকা-অ্যালুমিনিয়াম বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, এটি পর্যায় সারণিতে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে শুরু হওয়া সারিতে অ্যালুমিনিয়ামের পরের ফাঁকা জায়গায় থাকার কথা এবং তিনি এর আপেক্ষিক এবং পারমাণবিক ওজনের পাশাপাশি

এর পারমাণবিক আয়তনের আনুমানিক মানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কয়েক বছর পরে, লেকোক ডি বোইসবউদ্রান কার্যত এই উপাদানটিই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সামান্য ফারাকসহ মেন্ডেলিয়েভের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তার সাথে মিলে যায়। ইক্যালুমিনিয়াম বর্তমানে গ্যালিয়াম।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩৬১) এই ঘটনা দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রথম সূত্রের উজ্জ্বল উদাহরণ।

তখন পর্যায় সারণিতে বস্তুজগতের মৌলিক উপাদানগুলিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ওজন অনুসারে সাজানো হয়েছিল। কারণ, পরমাণুর নিউক্লিয়াস তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে কোনও কিছু জানা ছিল না, তাই নির্দেশক হিসাবে পারমাণবিক ওজন ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। নিউক্লিয়াসের গঠন বুঝার পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পারমাণবিক ওজন নয়, পারমাণবিক সংখ্যা মৌলিক উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই অনুযায়ী আধুনিক পর্যায় সারণি তৈরি করা হয়। এঙ্গেলসের কাছে আধুনিক পর্যায় সারণি অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে এটি আবিষ্কৃত হলে এঙ্গেলস বোধ করি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কারণ, দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রথম সূত্রের এত সুন্দর উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। পারমাণবিক সংখ্যার অর্থ পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটনের সংখ্যা। পারমাণবিক সংখ্যা ১ হলে হাইড্রোজেন, তার সংখ্যা পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২ হলে হিলিয়াম, ৩ হলে লিথিয়াম, ৪ হলে বেরিলিয়াম, ৫ হলে বোরন, ৬ হলে কার্বন, ৭ হলে নাইট্রোজেন, ৮ হলে অক্সিজেন-এইভাবে বস্তুজগতের সব কয়টি মৌলিক পদার্থ এই নিয়ম মেনে গঠিত। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের কী আশ্চর্যরকম উদাহরণ–পরমাণুর কেন্দ্রে একটা করে প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর একেকটা গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মৌলপদার্থ তৈরি হচ্ছে।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম একইরকমভাবে কার্যকরী তা মার্কস আলোচনা করে দেখিয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে আমরা জানি। সেই সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলো যত উন্নত হতে থাকে, উন্নত হাতিয়ারের ব্যবহার হতে থাকে ততই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি পরিমাণতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় এই উৎপাদিকা শক্তি এমন এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায় যখন প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক না ভেঙে সেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ আর সম্ভব হয় না। গুণগতভাবে ভিন্ন নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এইভাবেই পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তন সমাজে আসে। ইউরোপের গিল্ড-ব্যবস্থার মধ্যেই কীভাবে পুঁজির উন্মেষ ঘটেছিল এবং সেখান থেকে পুঁজিবাদের জন্মলগ্নে এই নিয়ম কীভাবে কার্যকরী হয়েছে তার উদাহরণ মার্কস দিয়েছেন *দাস ক্যাপিটাল* গ্রন্থে। গিল্ড ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে হলে একজনকে প্রথমে ঢুকতে হতো শিক্ষানবিশ (apprentice) কারিগর (Craftsman বা Artisan) হিসাবে। এই পর্বে তাদের কখনো কখনো প্রায় ৭/৮ বছর বেগার খাটতে হতো, কোন মজুরি মিলত না। এর পরের স্তরে উন্নীত হলে তাদের বলা হতো 'জার্নিম্যান' (journeyman) অর্থাৎ এই সময় সে দিনমজুরি

পেতো। এর পরের স্তরে যেতে হলে একজন জার্নিম্যানকে দিতে হতো তাঁর দক্ষতার চূড়ান্ত পরীক্ষা–তাকে বানিয়ে দেখাতে হতো তাঁর হাতের কাজ। যদি গিল্ডকর্তারা সেই শিল্পকর্মকে 'মাস্টারপিস' (masterpiece) হিসাবে স্বীকৃতি দিত তবেই সে হতো 'মাস্টার'। এখান থেকেই 'মাস্টারপিস' শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ এমন একটি শিল্পকর্ম যা সৃষ্টি করে জার্নিম্যান 'মাস্টার' পদমর্যাদায় উন্নীত হয়-'a work by which a craftsman attains the rank of master.'। কেউ মাস্টার হলেই নিজে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য শুরু করতে পারত এবং কিছু 'অ্যাপ্রেনটিস' ও 'জার্নিম্যান' হিসাবে লোক নিয়োগ করতে পারত। একজন মাস্টার যত বেশি লোক নিয়োগ করতে পারবে তাঁর হাতে আসবে ততবেশি উদ্বৃত্ত মুনাফা, তাঁর ভাণ্ডারে ততবেশি হারে পুঁজি সঞ্চিত হতে থাকবে। এই সঞ্চিত পুঁজি থেকেই আরও বেশি বেশি করে কারিগর নিয়োগ করে অধিকতর মুনাফার আকাঙ্ক্ষার জন্ম। আর বেশি করে কারিগর নিয়োগের অর্থ গিল্ড ব্যবস্থা ভেঙে এক জায়গায় কারিগরদের বসিয়ে ফ্যাক্টরি প্রথার উন্মেষ। অর্থাৎ, পুরনো গিল্ড ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। *দাস ক্যাপিটাল*-এ এই ঘটনার উল্লেখ করে মার্কস লিখেছেন :

'একজন "মাস্টার অব ট্রেড" (master of a trade) যাতে পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হতে না পারে তা জোর করে আটকানোর জন্য কত শ্রমিক একজন "মাস্টার" নিযুক্ত করতে পারবে তার উচ্চতম সীমা একটা ন্যূনতম সংখ্যার মধ্যে বেঁধে দিতে মধ্যযুগের গিল্ডগুলি চেষ্টা করেছিল। অর্থ বা পণ্যের অধিকারী "মাস্টাররা" প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতিতে পরিণত হতে পারত কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যখন উৎপাদনের জন্য সর্বনিম্ন অগ্রিম লগ্নি মধ্যযুগের সর্বাধিক পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। হেগেলের (তাঁর *লজিক* বইতে) আবিষ্কৃত নিয়মটির যথার্থতা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই এখানেও প্রমাণিত হয় যে, একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরে শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৩১৩)

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের নেপোলিয়নের সমরশাস্ত্র থেকে একটা বেশ মজার উদাহরণ দিয়েছেন এঙ্গেলস তাঁর *অ্যান্টি-ড্যুরিং* বইতে। মধ্যপ্রাচ্যের মামেলুকদের সাথে ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনীর যুদ্ধের ঘটনা। এঙ্গেলস লিখছেন :

'তিনি (নেপোলিয়ন) ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে মামেলুকদের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। ফরাসি বাহিনীর ঘোড়সওয়ার হিসাবে ছিল অদক্ষ কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ। অন্যদিকে মামেলুকরা নিঃসন্দেহে একের সাথে একের যুদ্ধের জন্য ছিল তাদের সময়ের সেরা ঘোড়সওয়ার, কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। "২ জন মামেলুক নিঃসন্দেহে ৩ জন ফরাসির জন্য যথেষ্ট ছিল; ১০০ জন মামেলুক ১০০ জন ফরাসিদের সমান ছিল; ৩০০ জন ফরাসি সাধারণত ৩০০ জন মামেলুকে হয়তো পরাজিত করতে পারে এবং ১,০০০ জন ফরাসি সবসময় ১,৫০০ জন মামেলুকে নিশ্চিতভাবে পরাজিত করতে পারে।"

ঠিক যেমন মার্কস উল্লেখ করেছেন যে, পুঁজিতে রূপান্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন পরিমাণ বিনিময় মূল্যের প্রয়োজন ঘটে, যদিও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের হের-ফের ঘটে। তেমনি নেপোলিয়নের অশ্বারোহী বাহিনীকেও অনিয়মিত

অশ্বারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে ও শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠা সম্ভব করে তুলতে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যার প্রয়োজন হয়েছিল, যদিও বিরুদ্ধ পক্ষে ছিল অনেক বেশি সংখ্যার একদল দক্ষ ঘোড়সওয়ার ও যোদ্ধা এবং অন্তত ফরাসিদের মতোই তাঁরা ছিল সাহসী।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-১১৯)

তাহলে, ফরাসি ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা ২ থেকে ১০০, তারপর ৩০০, সেখান থেকে ১০০০ হচ্ছে এবং, নেপোলিয়নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যুদ্ধে জয়লাভের প্রেক্ষিতে ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনীর গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটছে।

জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে গুণগত অবস্থা পরিবর্তনের নিয়ম মেনেই ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, রংয়ের উপলব্ধির সময় মানুষের চোখে কী ঘটে তা আলোচনা করতে জুলিয়ান হাক্সলি লিখেছেন :

'আমরা জানি যে আমাদের বিভিন্ন রংয়ের সংবেদনগুলি আমাদের রেটিনায় প্রাপ্ত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাণগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। আমরা আরও জানি যে অপটিক স্নায়ুতে এই বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উদ্দীপনা গুণগতভাবে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয় (qualitatively different sets of electrical impulses)।'

এই পর্যন্ত আলোচনা শুনে কারো কারো মনে হতে পারে যে, পরিবর্তনের রূপটা তাহলে শুধুই একমুখী–পরিমাণ থেকে গুণের রূপান্তর। কিন্তু সেটা বুঝলে খুবই ভুল বুঝা হবে, বিষয়টা তেমন যান্ত্রিক ও একপেশে নয়। মার্কস-এঙ্গেলস তার সাথে যে 'ভাইসি-ভার্সা' জুড়েছেন সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গুণগত পরিবর্তনের কারণে পরিমাণগত পরিবর্তনও যুক্ত থাকে। এই পরিবর্তনটা কখনও সাথে সাথেই ধরা যায়, কখনও বা অব্যবহিত পরেই ঘটে না–তারজন্য সময় লাগে। আবার, সেই পরিবর্তন দুইদিকেই হতে পারে-অর্থাৎ হ্রাসের দিকে হতে পারে, বৃদ্ধির দিকেও হতে পারে। যেমন, পানির ঘনীভবনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা যায়। যে পরিমাণ পানি তরলাবস্থা থেকে ঘণীভূত হয়, কঠিনাবস্থায় বরফ আয়তনের (volume) দিক থেকে পরিমাণে বেড়ে যায়, অর্থাৎ বরফের ঘনত্ব পানির তুলনায় কমে যায়। এইজন্য বরফ পানিতে ভাসে। যদিও, তরল পদার্থের মধ্যে এটা কেবলমাত্র পানির ক্ষেত্রেই ঘটে। কমে যাওয়ার উদাহরণও আছে। ধরা যাক যে, গার্মেন্টস কারখানায় কোন একটা কাজ করার জন্য একটা মেশিনে চারজন কারিগর প্রয়োজন। এবার সেই মেশিনের জায়গায় কোন কম্প্যুটারাইজড প্রি-প্রোগ্রামড কোন মেশিন এলো। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন এলো। দেখা যাবে প্রয়োজনীয় কারিগরের সংখ্যা কমে এক হয়ে গেল। ঢাকা–বরিশাল যাতায়াত ব্যবস্থা তো চোখের সামনের উদাহরণ। আপনারা খেয়াল করে দেখুন পদ্মাসেতু হওয়ার আগে ঢাকা থেকে বরিশাল যাওয়া ও আসার জন্য প্রতিদিন কয়টা লঞ্চ চলাচল করত, আর কয়টা বাস চলাচল করত। পদ্মাসেতু হওয়ার পর অর্থাৎ চলাচল ব্যবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটল। আগে যেটা ছিল মূলত নদীপথ-নির্ভর, সেটার চরিত্র পাল্টে হয়ে গেল স্থলপথ- নির্ভর। দেখা যাবে লঞ্চের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে আর বাসের সংখ্যা

বেড়ে গিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্র বিবেচনা করলেও আমরা গুণগত পরিবর্তন যে পরিমাণগত পরিবর্তন আনে তা লক্ষ্য করব। আগে হাল-বলদে চাষ হতো, তার পরিবর্তে অনেক জায়গায় এসেছে পাওয়ার-টিলার বা ট্র্যাক্টর। এই কারণে গ্রামে হাল-বলদের সংখ্যা কমে গেছে। একই সাথে যে পরিমাণ ক্ষেতমজুর জমি-চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা প্রয়োজন হতো, তাঁরাও সংখ্যায় কমে গেছেন। দুটো পরিবর্তনই কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন উপাদানের গুণগত পরিবর্তনের জন্য পরিমাণগত পরিবর্তনের উদাহরণ।

এটা যেহেতু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের একটা সাধারণ নিয়ম, সেই কারণে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আসার আগেই সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই নানাভাবে তেমন ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, খুবই প্রচলিত একটা প্রবাদ হলো – 'দশের লাঠি একের বোঝা'। এটাও একটা সুন্দর উদাহরণ। যখন একক তখন সেটা লাঠি, যেই সংখ্যায় অর্থাৎ পরিমাণে বাড়তে বাড়তে দশ হলো সেটা হয়ে গেল 'বোঝা'। 'বোঝা' দিয়ে কিন্তু 'লাঠি'-র কাজ চলবে না, 'লাঠি' ব্যবহারিক চরিত্রের দিক দিয়ে 'বোঝা' থেকে গুণগতভাবেই ভিন্ন। তেমনি, হর-হামেশাই আমরা বলতে শুনি 'বিন্দু বিন্দু জল দিয়েই তো সমুদ্র তৈরি হয়'। এর মাঝেও তো বিন্দু বিন্দু করে জলের পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে বিশালাকৃতি সমুদ্রের গুণগতভাবে পার্থক্য বুঝাতে মানুষ এমন কথা বলে। যাই হোক, প্রথম সূত্রের অনেক উদাহরণ আলোচনা হলো। আমি আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আপনারাও আপনাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনেক উদাহরণ খুঁজে পাবেন। এবার আমরা দ্বিতীয় সূত্রের প্রসঙ্গে যাই।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র : বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রাম (Law of Unity and Struggle of Opposites)

এঙ্গেলস বলেছেন 'The law of the interpenetration of opposites'। interpenetration-এর[৭] বাংলা অর্থ 'পরিব্যাপ্তি'। তবে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সকলেই এঙ্গেলসের এই সূত্রটিকেই ব্যক্ত করেছেন 'বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রাম' বলে।

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, সবকিছুরই নেতিবাচক দিক আছে, আবার একই সাথে তার মধ্যে ইতিবাচক দিকও আছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক-এর পারস্পরিক বিরোধ ও ঐক্যের অভিজ্ঞতা আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই। সাদা-কালো, সত্য-মিথ্যা, উঁচু-নিচু, বৃদ্ধ-জোয়ান, যোগ-বিয়োগ, বিকাশ-বিনাশ, জন্ম-মৃত্যু, গরম-ঠান্ডা, অচল-সচল, গতি-স্থির, লাভ-ক্ষতি, ধনাত্মক-ঋণাত্মক, ছোট-বড়, কাছে-দূরে, উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু, স্থান (space) ও বস্তু (matter), তরঙ্গ (wave) ও কণা (particle) ইত্যাদি প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত এবং পরস্পরসাপেক্ষ। গরম বলে কিছু থাকতেই পারে না যদি ঠান্ডার ধারণা না থাকে।

৭. মাও বলেছেন –'অভিন্নতা (Identity), ঐক্য (unity), সমাপতন (coincidence), পরিব্যাপ্তি (interpenetration), আন্তর্ব্যাপন (interpermeation), আন্তঃনির্ভরতা (interdependence) (অথবা অস্তিত্বের জন্য পারস্পরিক নির্ভরতা), আন্তঃসংযোগ (interconnection) বা পারস্পরিক সহযোগিতা (mutual co-operation)- এই সমস্তই একই জিনিসকে বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা।' (অন কনট্রাডিকশন)

একটা চুম্বক-দণ্ড যদি নেই, তাহলে তার একদিকে উত্তরমেরু থাকবে অন্যদিকে দক্ষিণমেরু থাকবে। এবার যদি মাঝখান দিয়ে কেটে দণ্ডটিকে দুই টুকরো করে ফেলি, তাহলে যে অংশে উত্তরমেরু ছিল সেই টুকরোতে অন্যপাশে দক্ষিণমেরু তৈরি হবে, তেমনিভাবে অন্য খণ্ডাংশে দক্ষিণমেরুর উল্টোদিকে উত্তরমেরু তৈরি হবে। একটিকে ছাড়া দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব থাকে না।

আমরা যখন প্রকৃতির দিকে তাকাই, সকল ক্ষেত্রেই আমরা দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা বা শক্তির দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের গতিশীল অবস্থান দেখতে পাই। প্রকৃতির সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সহজাত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আছে। তাদের যেমন অতীত আছে, তেমনি ভবিষ্যত আছে। প্রকৃতিতে কিছু জিনিসের বিনাশ হচ্ছে এবং আবার পাশাপাশি কিছু জিনিস বিকশিত হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু, নতুন ও পুরাতন, বিনাশ ও বিকাশ, নেতি ও ইতি, অতীত ও ভবিষ্যত ইত্যাদি দুই বিপরীতের মধ্যে অবিরত সংগ্রাম চলছে। প্রকৃতি ও বস্তুজগতের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কারণে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব মনে করে সদা পরিবর্নতশীল বস্তুজগতের বিকাশের যে প্রক্রিয়া তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম। অথবা, আমরা সহজ করে বলতে পারি যে, বিকাশের ধারা হিসাবে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের যে সূত্র আমরা উপরে আলোচনা করলাম তার অন্তর্বস্তু হলো এই দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম। প্রকৃতিতে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বস্তুর বা ঘটনার (phenomenon) বিকাশের প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি। সেই প্রক্রিয়া এমন নয় যে, সেখানে সংঘাত নেই, এমন নয় যে তা কেবল সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ক্রম-উন্মোচিত হয়, বরং তা হলো বস্তুর বা ঘটনার অন্তর্নিহিত বিরোধের 'সংগ্রাম', যা এই দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে ক্রিয়া করে, তারই প্রকাশ ঘটে। লেনিন তাঁর *Philosophical Notebooks*-এ উল্লেখ করেছেন 'সঠিক অর্থে দ্বান্দ্বিকতা হল বস্তুসত্তার অন্তঃস্থ বিরোধের পাঠ' (In its proper meaning dialectics is the study of the contradiction within the very essence of things.)। অন্য একজায়গায় বলেছেন–'বিকাশ হলো বৈপরীত্যের "সংগ্রাম"' (Development is the 'struggle' of opposites.)।

পদার্থবিজ্ঞানে পরমাণুর গঠন জানতে পারা ও একই সাথে কণাপদার্থবিদ্যার বর্তমান অগ্রগতি প্রকৃতিতে বিরোধসমূহের ঐক্য ও সংগ্রাম বৈশিষ্ট্যকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। একটা পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) রয়েছে যেখানে রয়েছে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন এবং আধানহীন নিউট্রন। তাহলে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সমস্ত প্রোটন যেহেতু সমধর্ম আধানবিশিষ্ট (ধনাত্মক) সেইকারণে তারা একে অপরকে প্রবলভাবে বিকর্ষণ করে। কিন্তু সবল নিউক্লিয় বলের (strong nuclear force) উপস্থিতি প্রোটন এবং নিউট্রনকে একত্রে বেঁধে রাখে। তাহলে পরমাণুর অভ্যন্তরের নিউক্লিয়াসে একই সাথে দুই বিপরীত শক্তি কাজ করছে–আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। অর্থাৎ, একদিকে রয়েছে প্রবল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এবং অন্যদিকে রয়েছে এই দুই বিরোধের ঐক্য। বিরোধসমূহের দ্বন্দ্ব আর ঐক্যের প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস সুস্থিত থাকে।

নিউক্লিয়াসে প্রতিমুহূর্তে প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে এক প্রকারের কণার বিনিময় হতে থাকে যাকে বলা হয় মেসন কণা। এই প্রক্রিয়াই একটি শক্তিশালী আকর্ষণীয় বল তৈরি করে যা প্রোটনের মধ্যে বিকর্ষণকারী ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক বলের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসকে সুস্থিত রাখে। এই ঘটনা দ্বিতীয় সূত্রের পাশাপাশি প্রথম সূত্র অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনেরও উদাহরণ বটে। যেমন, মেসন কণার সৃষ্টি হয় যখন নিউট্রন ও প্রোটন কাছাকাছি আসে। এদের মধ্যে দূরত্ব যখন খুব কম হয় তখন তৈরি হয় পাইয়ন (pion) আর দূরত্ব যখন একটু বেড়ে যায় তখন তৈরি হয় রো-মেসন (Rho-meson)। এই পাইয়ন আর রো-মেসন উভয়ই মেসন, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য আছে। তাহলে, কি বুঝা গেল? বুঝা গেল যে, দূরত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে মেসন দুই প্রকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। দুটোই মেসন, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। শুধুমাত্র একটা উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট। পাইয়নের আধান ধনাত্মক হতে পারে, ঋণাত্মকও হতে পারে, কিন্তু রো-মেসন নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন আধান নেই।

আমরা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কথা বলছিলাম। কিন্তু নিউক্লিয়াস পরমাণুর খুব কম স্থান নিয়ে থাকে, তার বাইরে নিউক্লিয়াসের চারপাশে কক্ষপথে[৮] আবর্তিত হচ্ছে ঋণাত্মক আধানের ইলেকট্রন। সমস্ত ইলেকট্রন সমধর্ম চার্জবিশিষ্ট (ঋণাত্মক) হওয়ায় তারা একে অপরকে বিকর্ষণ করে, অর্থাৎ তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে চায়। পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট প্রোটন এবং কক্ষপথে আবর্তিত ঋণাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট ইলেকট্রন সৃষ্টি করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বল যার কারণে এদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ তৈরি করে। এই দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে। তাহলে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? একটি পরমাণুর মধ্যে দুটি বিপরীত শক্তি কাজ করছে-আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেও দুইটি বিপরীত শক্তি কাজ করছে–আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। বস্তুর পরমাণুর অস্তিত্ব এই দুই বিপরীত শক্তির লড়াই এবং ঐক্যের ভিত্তিতে সুস্থিত থাকে বা ঐক্য থাকে। কিন্তু এই দুই বিরোধের মধ্যে যে ঐক্য তা ভেঙে বেরিয়ে আসার লড়াইও বিদ্যমান। নিউক্লিয়াসে অতিরিক্ত নিউট্রন যুক্ত হলে নিউক্লিয়াসের এই ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং নিউক্লিয়াস ভেঙে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি করে। নিউক্লিয়ার ফিশনে এটিই ঘটে।

প্রকৃতির সর্বত্রই এই দ্বৈততা দেখা যাবে। আমরা যদি প্রকৃতির মৌলিক কণা, বা প্রাথমিক কণার (fundamental or Elementary particle) কথা বিবেচনা করি তবে সেখানেও দেখা যাবে যে, তার মধ্যে দুই ধরনের কণা আছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। একদলকে বলা হয় ফার্মিয়ন কণা–যেমন প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন। এদেরকে ফার্মিয়ন বলার কারণ হচ্ছে এরা ফার্মি-ডিড়াক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আচরণ করে। আর অন্য দলকে বলা হয় বোসন–যেমন

৮. সাধারণভাবে বুঝার জন্য আমরা কক্ষপথ বলে উল্লেখ করছি, যদিও গ্রহের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরে না, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে মেঘের মতো থাকে (probabilistic cloud around the nucleus)।

ফোটন কণা। এদের বোসন বলার কারণ এদের আচরণ বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে। বোসন এবং ফার্মিয়নগুলির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো একে অপরের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া। বোসন একে অপরকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে ফার্মিয়নরা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। এই রকম অনেক দিক থেকেই এদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে এবং এরা একে অপরের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট।

মৌলিক কণার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য এবং ঐক্য সুস্পষ্ট হয়, কারণ প্রতিটি কণারই আবার প্রতি-কণা বা বিপরীত কণা আছে। বিপরীত বা প্রতি-কণা এই কারণে যে, তাদের ভর সমান কিন্তু আধান বিপরীত। যখন একটি কণা এবং একটি প্রতিকণা সংস্পর্শে আসে, তারা একে অপরকে ধ্বংস করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ইলেক্ট্রনের প্রতিকণা, যাকে পজিট্রন বলা হয়, এর ভর ইলেকট্রনের সমান কিন্তু এর ধনাত্মক চার্জ রয়েছে। একইভাবে প্রোটন তারও প্রতিকণা আছে, যাকে অ্যান্টিপ্রোটন বলা হয়। এদের প্রোটনের সমান ভর কিন্তু ঋণাত্মক চার্জ রয়েছে। আবার, নিউট্রন যার কোন চার্জ নেই, তারও প্রতিকণা আছে, যাকে বলা হয় অ্যান্টি-নিউট্রন। অ্যান্টিনিউট্রনের ভর নিউট্রনের সমান, তবে এর বৈশিষ্ট্যগুলি কিছু ক্ষেত্রে নিউট্রনের বিপরীত।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তত্ত্বগতভাবে নতুন মৌল কণা হিসাবে কোয়ার্ক এবং গ্লুয়নের প্রস্তাব করা হয় এবং সত্তরের দশকেই পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজেও পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, গ্লুয়নের সমন্বয়ে (mediated) শক্তিশালী পারমাণবিক বলের দ্বারা দুই বা তিনটি কোয়ার্ক মিলিতভাবে একটি হ্যাড্রন কণা তৈরি করে। প্রোটন ও নিউট্রনসহ আরো কয়েকটি কণা হ্যাড্রনের অন্তর্গত। সেই অর্থে প্রোটন ও নিউট্রন মৌল কণা নয়, আদতে তারা কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। গ্লুয়ন সবল মিথস্ক্রিয়া কণা হিসাবে কাজ করে কোয়ার্ক কণাগুলোকে একত্রে ধরে রাখে। যদিও আমরা এখানে মৌল কণা বলে উল্লেখ করেছি যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রোটন এবং নিউট্রনকে কখনও কখনও 'প্রাথমিক' কণা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ তারা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক।

কোয়ার্ক সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য জানার জন্য এখনো গবেষণার অবকাশ আছে এবং সেই গবেষণা চলছে। তবে যতটুকু জানা গেছে তাতেই অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, নব আবিষ্কৃত 'কোয়ার্ক' কণাগুলির ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য ও ঐক্যের বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। কণাপদার্থবিদ্যায় এখনো পর্যন্ত ৬ ধরনের কোয়ার্কের কথা বলা হয়। তাদের নামও বেশ অদ্ভূত–আপ, ডাউন, টপ, বটম, চার্ম এবং স্ট্রেইঞ্জ। আমরা যদি ভরের ভিত্তিতে দেখি তবে দেখা যাবে এদের মধ্যে দুইটি শিবির আছে। যদি চার্জের দিক থেকে দেখি তবে দেখা যাবে তারা দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। যদি স্থায়িত্বের দিক থেকে বিবেচনা করা যায় তবে দেখা যাবে একদলের এক নিমিষ মাত্র জীবনকাল, কিন্তু অন্যদল বেশ স্থিতিশীল। একদল আবার শুধুমাত্র হাই-এনার্জি-কলিশনের মধ্য দিয়েই দেখা মেলে, অন্যদল কিন্তু প্রাত্যহিক বস্তুতেই মেলে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রের যথার্থতা প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলকণা সম্পর্কিত কণাপদার্থবিদ্যার এইসব আবিষ্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমগ্র মহাবিশ্ব অণু, তার অভ্যন্তরের পরমাণু এবং উপ-পরমাণু কণা দ্বারা গঠিত, বিপরীতের ঐক্য পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই মৌলিক কণাগুলি হলো মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ এবং শক্তির মৌলিক গঠন ভিত্তি (building block) এবং তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মিথস্ক্রিয়াগুলি সবচেয়ে মৌলিক স্তরে পদার্থের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদার্থবিদ্যার এই সমস্ত আধুনিকতম গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের অন্য একটি ব্যাখ্যাকেও প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। বিশেষত নিউটনের গতিসূত্রের পর থেকে যে প্রশ্ন ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বা যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা খুব জোরেশোরে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বলে এসেছে। তাহলো গতির উৎস কি? নিউটনের বলবিদ্যা অনুযায়ী বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে সচল বস্তু চিরকাল সচল এবং অচল বস্তু চিরকাল অচল থাকার কথা। তাহলে, এই যে গ্রহ-তারারা মহাবিশ্বে ঘুরছে তাদের প্রথম ধাক্কা কে দিল? বিপরীতের ঐক্যের এই সার্বজনীন ঘটনাটি বাস্তবে প্রকৃতির সমস্ত গতি ও বিকাশের গতিদায়ক শক্তির ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, চলন এবং পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য তত্ত্বে বাহ্যিক ধাক্কা বা তাড়নার প্রস্তাবনার প্রয়োজন হয় না- যা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী দর্শনে এবং সমস্ত যান্ত্রিক বস্তুবাদী তত্ত্বের মৌলিক দুর্বলতা। সমস্ত ধরণের পদার্থের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিরোধপূর্ণ বৈপরীত্য এবং অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনই গতির উৎস। আমরা দেখেছি প্রোটন এবং ইলেকট্রনের ঐক্যের ফলে একটি নিউট্রন তৈরি হয়। কিন্তু যদি একটি পজিট্রন একটি নিউট্রনের সাথে একত্রিত হয়, তাহলে ফলাফল হয় যে, একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং নিউট্রন একটি প্রোটনে পরিবর্তিত হয়। এই অবিরাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাবিশ্বের ভাঙাগড়ার কাজ চলছে। সেই কারণে কোন বস্তুর গতির জন্য বাহ্যিক শক্তির প্রয়োজন নেই। 'প্রথম ধাক্কা' দেওয়ার জন্য কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজন নেই। সাধারণ আপেক্ষিকতার ধারণা আসার পর আমরা জানি গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুর গতির কারণ মহাকাশের জ্যামিতি। বস্তুর নিজস্ব বস্তুগত নিয়ম অনুসারে অসীম, অস্থির গতিবিধি ছাড়া প্রকৃতির অন্যকিছুর প্রয়োজন নেই।

এই বিষয়টি এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করে বলেছেন–'সমস্ত গতি "আকর্ষণ" এবং "বিকর্ষণ"-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে উৎসারিত। গতি, যাইহোক, শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন প্রতিটি পৃথক আকর্ষণকে অন্য কোথাও একটি সংশ্লিষ্ট বিকর্ষণ দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। অন্যথায় সময়ের সাথে সাথে এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর প্রাধান্য করবে এবং তারপরে গতি চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মহাবিশ্বের সমস্ত আকর্ষণ এবং সমস্ত বিকর্ষণ অবশ্যই একে অপরের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। শক্তিকে সৃষ্টি করা যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না-শক্তির এই অবিনশ্বরতার নিয়মটি এইভাবেই প্রকাশিত হয় যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি আকর্ষণজনিত গতি অবশ্যই তার পরিপূরক হিসাবে কোন বিকর্ষণজনিত গতির সমতুল্য এবং তদ্বিপরীত হতে হবে। বল বা শক্তির সংরক্ষণের নিয়ম প্রকৃতি-

বিজ্ঞানে প্রণয়নের অনেক আগে প্রাচীন দর্শনে এটি এইভাবে প্রকাশ করেছিল: মহাবিশ্বের সমস্ত আকর্ষণের যোগফল সমস্ত বিকর্ষণের সমষ্টির সমান।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-৩৬৪)

প্রকৃতির স্বরূপই হলো বৈপরীত্যের ঐক্য–যেমন, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সংঘর্ষ ও ঐক্য। মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই উপলব্ধি থেকেই এঙ্গেলসের সময়ে 'শক্তি' (energy)-কে যেভাবে দেখা হতো সেটা অসম্পুর্ণ মনে করেছিলেন এঙ্গেলস। তিনি বলেছিলেন–'"শক্তি" ধারণাটি কোনোভাবেই শক্তির সম্পূর্ণ সম্পর্ককে সঠিকভাবে প্রকাশ করে না, কারণ এটি শুধুমাত্র একটি দিককে বোঝায়, ক্রিয়া কিন্তু প্রতিক্রিয়া নয়। এখনও এটিকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন "শক্তি" বস্তুর বাহ্যিক কিছু, যেন এর মধ্যে কিছু প্রোথিত করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় "বল"-এর অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ- ৩৭১)

প্রকৃত সম্পর্কটি আইনস্টাইনের ভর এবং শক্তির সমতুল্য তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যা দেখায় যে, পদার্থ (mass) এবং শক্তি (energy) এক এবং অভিন্ন জিনিস। এই হলো অবিকল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফল-যেমনটি এঙ্গেলস প্রকাশ করেছিলেন।

এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্ল মার্কস ব্যবহার করেছেন সমাজের বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় এবং বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণে। ইতিহাস পর্যালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, বিরোধসমূহের দ্বন্দ্ব সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে কীভাবে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। কীভাবে আদিম সাম্যাবস্থা থেকে দাস সমাজ ব্যবস্থা, সেখান থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নির্দিষ্ট সমাজের বিশেষ উৎপাদন সম্পর্কের সাথে উৎপাদিকা শক্তির (উৎপাদনের হাতিয়ার + দক্ষ শ্রম) দ্বন্দ্ব রয়েছে। উৎপাদিকা শক্তির অব্যাহত গতি বৃদ্ধি পুরনো উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে সমাজের নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়া সম্ভব হয় না। তেমনি আবার পুরনো উৎপাদন সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখতে হলে উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ ব্যবহার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও এই দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম আছে, আবার বৈপরীত্যের ঐক্য আছে। এই সমাজে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ারের মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণি, যাদের উদ্দেশ্য হলো যতবেশি সম্ভব উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করা। অন্যদিকে আছে শ্রমিক যাদের একমাত্র উপায় হলো শ্রমশক্তি বিক্রি করে ন্যূনতম জীবিকার সংস্থান করা। এই দুইশ্রেণির স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত এবং দ্বান্দ্বিক। উৎপাদনে শ্রমিক যে শ্রম দেয় তার চরিত্র সামাজিক, কারণ সমাজের সকল শ্রমিকই শ্রম দেয়। আবার, শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্য তার চরিত্রও সামাজিক, কারণ সেই পণ্য একা মালিকের ভোগে লাগে না, সবার কাছে তাকে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর মালিকানার চরিত্র ব্যক্তিগত, মুনাফার চরিত্রও ব্যক্তিগত। স্বাভাবিকভাবেই এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং সংগ্রাম রয়েছে। আবার, যতদিন পুঁজিবাদী সমাজ আছে ততদিন এই দুই শ্রেণির ঐক্য আছে বলেই উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে থাকে।

কার্ল মার্কসের *দাস ক্যাপিটাল* থেকেই আর একটি উদাহরণ দেখি। *কমিউনিস্ট ইশতেহার* এ বলা হয়েছিল যে, পুঁজিবাদ পূর্ববর্তী সমস্ত সমাজে উৎপাদক শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম শর্তই ছিল উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতিগুলোকে অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রাখা। সেখানে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়ারা উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের ক্রমাগত বিপ্লব না ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। পুঁজি গ্রন্থে কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন যে, বুর্জোয়াদের এই অস্তিত্বরক্ষার শর্তপূরণে অনিরসনীয় বিরোধ বা দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। বুর্জোয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন এক শ্রম-বিভাজন নিয়ে আসে যেখানে শ্রমিককে আজীবন দিনের পর দিন অভিন্ন একটি তুচ্ছ কাজ করে যেতে হয়। আবার, আধুনিক শিল্পের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়া, নতুন প্রযুক্তি এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণির ক্রমাগত উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিকেই শুধুমাত্র পরিবর্তন করতে হয় তা নয়, শ্রমিকের নির্দিষ্ট কর্ম এবং শ্রম প্রক্রিয়ার সামাজিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন হয়। একই সাথে, এর ফলে সমাজের মধ্যে শ্রম-বিভাজনে বিপ্লব ঘটায় এবং অবিরামভাবে বিপুল পরিমাণ পুঁজি এবং শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখা প্রবর্তন করতে হয়। একদিকে যখন আধুনিক শিল্প স্বভাবগতভাবে শ্রমের ভিন্নতা, কর্মের সাবলীলতা, শ্রমিকের সার্বজনীন গতিশীলতার প্রয়োজন দাবি করে, অন্যদিকে, ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ শ্রমের পুরানো বিভাজনকে তার অনড় বিশেষীকরণের সাথে বজায় রাখতে চায়। আধুনিক শিল্পের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং এর পুঁজিবাদী রূপের অন্তর্নিহিত সামাজিক চরিত্রের মধ্যে নিরঙ্কুশ দ্বন্দ্ব শ্রমিকের অবস্থার সমস্ত স্থিরতা ও নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে। একদিকে, এই ব্যবস্থা শ্রমিকের হাত থেকে তার জীবিকা নির্বাহের উপায় কেড়ে নেয়, উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগকে দমন করে এবং তাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য তার হাত থেকে ক্রমাগত শ্রমের উপকরণ কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেয়।[৯] (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৪৮৯-৪৯০)

অন্যদিকে, যেহেতু বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হয়, নতুন প্রযুক্তি আনতে হয়, সেই কারণে কাজের বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিককে শারীরিকভাবে উপযুক্ত করে তুলতে হয়, বৈচিত্র্যময় দক্ষতার সর্বাধিক সম্ভাব্য বিকাশের প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিও দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র 'বিপরীতসমূহের বিরোধ ও ঐক্য'-এর উদাহরণ।

কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কিত অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন *নিউইয়র্ক ট্রিবিউন* এ যেখানে তিনি ব্রিটিশ রাজত্ব কীভাবে ভারতের দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছে, তাঁত ধ্বংস করে তাঁতিদের জীবিকাচ্যুত করে ভারতের রপ্তানি শিল্পকে ধ্বংস করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি হলো ইতিহাসের ঘটনাবলির একটি দিক। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে তিনি এর বৈপরীত্যটিও উল্লেখ করেছেন। 'দ্য ব্রিটিশ রুল

৯. মার্কস শেক্সপিয়ারের নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' থেকে দুটো লাইন উদ্ধৃত করেছেন-'You take my life/ when you do take the means whereby I live.'

ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন :

'এটা সত্য যে, ইংল্যাণ্ড হিন্দুস্তানে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে শুধুমাত্র নিকৃষ্ট স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করার পদ্ধতিতে তারা ছিল নির্বোধ। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, এশিয়ার সামাজিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় (social state of Asia) মৌলিক বিপ্লব ছাড়া কি মানবজাতি তার ভবিতব্য নির্মাণ করতে পারত? তা যদি না হয়, তাহলে ইংল্যান্ডের অপরাধ যাই হোক না কেন, সেই বিপ্লব সংঘটনে ইংল্যান্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্য একটি প্রাচীন বিশ্ব-সভ্যতার বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্যে যত তিক্ততাই থাকুক না কেন, আমাদের অধিকার আছে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্যেটেকে উচ্চারণ করার:

"Sollte diese Qual uns qualen
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?"'

- সেই অত্যাচার কি কেবলই ক্লিষ্ট করে যা বয়ে আনে যার-পর-নাই সুখ? তৈমুরের শাসনের পথ ধরে হয়নি কি আত্মার অশেষ নির্বাণ?[১০] (মার্কস, ১৮৫৩, পৃ-১৩২-৩৩)

এই হলো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বা বিচারে বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতিফলন। সে বিচার একদেশদর্শী নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একচক্ষু হরিণের মতো শুধু একদিক দেখে না। যে কোন ঘটনারই দুটো দিক থাকে। একই ঘটনার ভেতর দুটো বিপরীত শক্তির লড়াই থাকে, বিপরীত ভাবনার প্রকাশ থাকে। এই কথা খেয়ালে না থাকলে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ভুল হয়ে যায়। ২০১৩ সালে আমাদের দলের একদল নেতা-কর্মীর দলত্যাগের ঘটনাও এমন এক উদাহরণ। দলত্যাগীদের চলে যাওয়ায় আমাদের দলের ক্ষতি হয়েছে, সাময়িকভাবে আমাদের সাংগঠনিক শক্তির বিকাশকে ব্যাহত করেছে, বহু ভালো, সম্ভাবনাময় ও গুণী কমরেডদের হারানোর বেদনা আছে। বেদনা আছে কারণ, যে সমস্ত কমরেডদের মধ্যে মার্কসবাদের উপলব্ধিতে ঘাটতি ছিল তাঁরা অনেকে বসে গেছেন। দলের উপর তো বটেই এমনকি কেউ কেউ মার্কসবাদের উপরই আস্থা হারিয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরে গেছেন। সার্বিকভাবে তাতে আমাদের দেশের বামপন্থি আন্দোলনেরও ক্ষতি হয়েছে। এটা হলো একটা নেতিবাচক দিক। আবার, ইতিবাচক দিক হলো যে, ভাববাদী অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে দলকে রক্ষা করা গেছে। দলত্যাগীদের চলে যাওয়ার সময়কার বিতর্কের কারণেই আমরা চিন্তার বদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পার্টিকে নতুন করে উজ্জীবিত

১০. রচনাবলিতে দেওয়া যে ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছেঃ 'Should this torture then torment us/Since it brings us greater pleasure? /were not through the rule of Timur /Souls devoured without measure?'

করতে পেরেছি, প্রশ্ন না করে মিথ্যা আপ্তবাক্য আউড়ে চলার মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ভুলকে স্বীকার করে এগিয়ে চলতে পেরেছি, সাংগঠনিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং গণবিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে পেরেছি। আমরা যে গোঁড়ামিবাদী অভ্যাসের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলাম তা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে আজকে কমরেডরা তাদের মতো করে সৃজনশীল চিন্তা ও বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারছে। কমরেড মাও 'বিরোধ প্রসঙ্গে' (On Contradiction) আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, একসময় ডেবোরিনের আদর্শবাদ চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে গোঁড়ামিবাদী চিন্তার প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, 'আমাদের বর্তমান দর্শন অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গোঁড়ামিবাদী চিন্তাধারাকে নির্মূল করা।' এই কথা বর্তমান সময়ে আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গোঁড়ামিবাদী ধ্যান-ধারণা, অভ্যাসের রেশ আমাদের আচরণের মধ্যে আজও যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে নির্মূল করতে হবে।

এই 'বিরোধ প্রসঙ্গে' বইতে কমরেড মাও দ্বন্দ্বতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এই ধারণাটির গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। এটি কমরেড মাও-এর মৌলিক অবদান। এই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমে পরিভাষা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করে নেই, অন্তত আজকের আলোচনার জন্য। 'কনট্রাডিকশন' শব্দের বাংলা আমরা কি করব? 'দ্বন্দ্ব' না 'বিরোধ'? বাংলা অনুবাদ কেউ করেছেন 'দ্বন্দ্ব', আবার কেউ করেছেন 'বিরোধ'। আমরা যেহেতু ডায়ালেক্টিক/ ডায়ালেক্টিকসকে বলছি 'দ্বন্দ্ব', ডায়ালেক্টিক্যাল'-কে বলছি 'দ্বান্দ্বিক'–যে কারণে 'থিয়োরি অব ডায়ালেক্টিকস' আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করছি 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব'–সেইকারণে 'কনট্রাডিকশন' শব্দকে বলছি 'বিরোধ'। আবার, দ্বন্দ্ব-তত্ত্বে আর একটি শব্দের বিশেষ তাৎপর্য আছে–তা হলো 'অ্যান্টাগনিজম' (Antagonism) বা অ্যান্টাগনিস্টিক (Antagonistic)। তাহলে এর বাংলা আমরা কি করব? অনেকেই ব্যবহার করছেন 'বিরোধাত্মক'। এমন ব্যবহারে দুটো সমস্যা। প্রথম, তাহলে 'অ্যান্টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশন'-এর বাংলা করতে হয়–'বিরোধাত্মক বিরোধ'। একসাথে দুই বিরোধের পাশাপাশি ব্যবহার বিভ্রান্তিমূলক। দ্বিতীয় সমস্যা লেনিন বলেছেন যে, 'অ্যান্টাগনিজম' আর 'কনট্রাডিকশন'এক নয়– 'Antagonism and contradiction are not at all one and the same. Under socialism, the first will disappear, the second will remain.' ।[১১] তাহলে বুঝার সুবিধার জন্য এই দুটোর জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করাই শ্রেয়। তাহলে 'অ্যান্টাগনিজম'-কে 'বৈরিতা' বা 'শত্রুতা' আর 'অ্যান্টাগনিস্টিক'-কে 'বৈরিতামূলক' বা 'শত্রুতামূলক' বলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি।

এবার আমরা কমরেড মাও-এর অবদান প্রসঙ্গে বা তাঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কমরেড মাও প্রথমে বিরোধের দুইটি দিকের কথা বলেছেন। একটা হলো তার

১১. V. I. Lenin, "Remarks on N. I. Bukharin's Economics of the Transitional Period" Selected Works, Russ. ed., Moscow-Leningrad, 1931, Vol. XI, p. 357. ('অন কন্ট্রাডিকশন'-এ কমরেড মাও-এর দেওয়া সূত্র অনুযায়ী)

সার্বজনীনতা (Universality of contradiction), অন্যটি হলো বিরোধের বিশেষ রূপ (Particularity of contradiction)। কমরেড মাও বলেছেন যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই বিরোধের সার্বজনীনতা সকলে বুঝতে পারেন। কিন্তু গোঁড়ামিবাদীরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে না যে, দ্বন্দ্বের বিশেষত্বের মধ্যেই দ্বন্দ্বের সার্বজনীনতা রয়েছে। তাঁরা বুঝতে পারে না যে, বৈপ্লবিক অনুশীলনের পথনির্দেশ করতে গেলে আমরা যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, সেইক্ষেত্রে বিরোধের বিশেষত্বের অনুধাবন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করতেই কমরেড মাও বিরোধের একটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তিনি বিরোধকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন–বৈরিতামূলক বা শত্রুতামূলক (antagonistic contradiction) এবং অ-বৈরিতামূলক বা অ-শত্রুতামুলক (non-antagonistic contradiction)। অর্থাৎ বিরোধ আছে মানে সেটা সবসময় শত্রুতামূলক নাও হতে পারে বা হয় না। কমরেড মাও-এর বক্তব্য 'বিরোধসমূহের সংগ্রামের প্রশ্নের মধ্যেই এই প্রশ্নটা সংযুক্ত আছে যে, কাকে শত্রুতামূলক বা বৈরিতামূলক বলব। আমাদের উত্তর হলো বিরোধসমূহের সংগ্রামের মধ্যে শত্রুতামূলক বা বৈরিতামূলক হলো একটি রূপ, কিন্তু সেটাই একমাত্র রূপ নয়।' (The question of the struggle of opposites includes the question of what is antagonism. Our answer is that antagonism is one form, but not the only form, of the struggle of opposites. (মাও, ১৯৩৭, পৃ-৩১৩) অর্থাৎ, বৈরিতা যেহেতু অন্যান্য রূপের মধ্যে একটি রূপ, বৈপরীত্যের সংগ্রামের একমাত্র রূপ নয়, সেহেতু বৈরিতার সূত্র যথেচ্ছভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করা যায় না। দ্বন্দ্বের সম্পর্কে যেখানেই বিরোধ আছে, তাকেই বৈরিতামূলক বিবেচনা করা যায় না। কমরেড মাও -এর এই ধারণাটিকে একটু ব্যাখ্যা করলে বুঝা যাবে।

মানব সমাজের বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, বিশেষ বিশেষ স্তরে যে বিভিন্ন শ্রেণিগুলো থাকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা বৈপরিত্যের সংগ্রামের একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ হিসাবে বিদ্যমান থাকে। যেমন, সেই স্তরের শোষক এবং শোষিত শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবেচনা করুন। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী শ্রেণি একই সমাজে দীর্ঘকাল সহাবস্থান করে। সেটা দাস সমাজ হোক, সামন্ত সমাজ হোক বা পুঁজিবাদী সমাজ হোক। তারা একে অপরের সাথে লড়াই করে; কিন্তু এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হলেই তা প্রকাশ্য বৈরিতার রূপ ধারণ করে এবং বিপ্লবে পরিণত হয়। কমরেড মাও একটা বোমার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার আগে একটি একক সত্তা, যেখানে বিপরীত শক্তিগুলি সেই পরিস্থিতিতে সহাবস্থান করে। বিস্ফোরণটি তখনই ঘটে যখন একটি নতুন অবস্থা, ইগনিশন উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কেউ সেখানে হয় সলতেতে আগুন দেয় বা বোমার উপর সজোরে কোন শক্তি প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে, সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা শেষ পর্যন্ত পুরানো দ্বন্দ্বের সমাধান করে নতুন সত্ত্বার জন্ম দেওয়ার জন্য প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ নেয়।

তারপর কমরেড মাও বললেন যে, বিরোধের শত্রুতামূলক বা অ-শত্রুতামূলক কোনটাই স্থায়ী রূপ নয়, তা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হয়। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি নির্দিষ্ট বৈপরীত্যের সংগ্রামের পরিস্থিতিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করতে হবে। তিনি বলেছেন–'বিরোধ এবং সংগ্রাম সর্বজনীন এবং নিরঙ্কুশ, তবে বিরোধ সমাধানের পদ্ধতিগুলি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপগুলি, বিরোধগুলির প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে পৃথক হয়। কিছু বিরোধ প্রকাশ্য বৈরিতামূলক বলে চিহ্নিত করা হয়, অন্যরা তা নয়। ঘটনার সুনির্দিষ্ট বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কিছু বিরোধ যা মূলত অ-বৈরিতামূলক ছিল তা বৈরিতামূলক রূপে পরিণত হয়, আর অন্যগুলি যা মূলত বৈরিতামূলক ছিল তা অ-বৈরিতামূলক হয়ে ওঠে।' (মাও, ১৯৩৭, পৃ-৩১৪)

একটা উদাহরণ দিলে খুব পরিষ্কার হবে। দেশের মধ্যে শ্রমিক এবং মালিকের দ্বন্দ্বের রূপ সর্বদাই বৈরিতামূলক। কিন্তু যখন বাইরের আগ্রাসী শক্তি দেশকে আক্রমণ করে তখন সাময়িকভাবে আগ্রাসীদের সাথে বিরোধটাই প্রধান এবং মূল বৈরিতামূলক বিরোধ হয়ে ওঠে, মালিক-শ্রমিকের বিরোধটা সাময়িকভাবে অ-প্রধান ও সাময়িকভাবে তখনকার মতো অ-বৈরিতামূলক হয়ে ওঠে। একটা কথা যেন খেয়াল থাকে। অ-বৈরিতামূলক বা অ-শত্রুতামূলক কথার অর্থ কিন্তু মিত্রতামূলক নয়, তাহলে তো বিরোধকেই অস্বীকার করা হয় বা বিরোধই থাকে না।

দ্বন্দ্বতত্ত্বে এই ভাবনা কমরেড মাও-এর মৌলিক অবদান।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের তৃতীয় সূত্র : এই সূত্রটি–'নিগেশন অব নিগেশন'[১২]-কে বাংলা অনুবাদে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। কেউ বলেছেন 'নেতির নেতি', কেউ বলেছেন 'বিনাশের বিনাশ', কেউ বলেছেন 'নিরোধের নিরোধ', 'নিরাকরণের নিরাকরণ' ইত্যাদি নানা রকম। আমরা আপাতত বিনাশের বিনাশ বলি।

দ্বান্দ্বিকতার তৃতীয় সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা বিকাশের অভিমুখকে প্রকাশ করে। প্রকৃতিতে পরিবর্তন একটি বদ্ধ বৃত্তের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া নয়, পুনরাবৃত্তি করে চলা নয়। 'অষ্টাদশ শতকের ফরাসিদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে যা ধারণা সেটা এই যে, তা সঙ্কীর্ণ চক্রে ঘূর্ণায়মান, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয়, গ্রহ-তারা সব চিরন্তন—যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই–যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স।' (এঙ্গেলস, ১৮৮০, পৃ-৩০৩)

তার পরিবর্তে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দর্শনের এই নিয়মটি বুঝায় যে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবর্তন আসলে বিকাশের অগ্রযাত্রার ইতিহাস-সহজ থেকে জটিল, নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে যাওয়া। কোন কোন পরিবর্তনের চেহারা বাইরে থেকে সাধারণভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মনে হলেও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি ঠিক একইভাবে নিজেদের পুনরাবৃত্তি করে না। এই সূত্রের মৌলিক তাৎপর্য বুঝাতে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, বিনাশ (negation) বলতে আমরা সাধারণভাবে যেমন নির্মূল করা বা

১২. এঙ্গেলস লিখেছিলেন 'Negation of the negation', বর্তমানে সবাই ব্যবহার করেন 'the' বাদ দিয়ে।

বাতিল করা বুঝি, দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই বিনাশ তেমন সহজ বা সরল নয়। বিকাশের সার্বজনীন প্রক্রিয়া অনুধাবনে ইতিহাসে, চিন্তায় বা প্রকৃতিতে গুণগতভাবে পৃথক কোন পর্যায়ের বা বস্তু সত্ত্বার আবির্ভাব বুঝতে হলে 'বিনাশের বিনাশ' একটি অপরিহার্য উপাদান। তিনি বলেছেন, বিনাশের বিনাশ হলো 'একটি অত্যন্ত সাধারণ-এবং এই কারণে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ-প্রকৃতির, ইতিহাসের এবং চিন্তার বিকাশের নিয়ম' (an extremely general–and for this reason extremely far-reaching and important–law of development of nature, history, and thought)

আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়কে ব্যাখ্যা করতে *দাস ক্যাপিটাল* বইতে মার্কস এই বিনাশের বিনাশ সূত্র ব্যবহার করেছেন। এই সূত্রের এই সুন্দর উদাহরণটি আমরা দেখি। তিনি লিখেছেন–'পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী আত্মসাতের পদ্ধতি জন্ম দেয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বত্বাধিকারীর শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এটি হলো ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম বিনাশ (negation)। কিন্তু প্রকৃতির যে নিয়ম কাউকেই মার্জনা করে না সেই নিয়মের ফলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ডেকে আনে তার নিজেরই বিনাশ। এটাই হল বিনাশের বিনাশ।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৬৩)

ড্যুরিং-এর সঙ্গে বিতর্কে উপরে উদ্ধৃত মার্কসের এই 'বিনাশের বিনাশ' প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এঙ্গেলস। তিনি বলেছেন–'পুঁজিবাদী যুগের পূর্বে অন্তত ইংল্যান্ডে ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। এর ভিত্তি ছিল উৎপাদনে শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তথাকথিত প্রাথমিক পুঁজির যখন সঞ্চয়ন ঘটতে থাকে (primitive accumulation of capital), তখন এই উৎপাদকদের উচ্ছেদের মাধ্যমেই তা সংঘটিত হয়, অর্থাৎ, অন্য কথায়, মালিকের নিজের শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির এখানে বিলোপ ঘটে। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, উল্লিখিত ক্ষুদ্র শিল্প তৎকালীন সংকীর্ণ সমাজ এবং তার স্থূল উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার সঙ্গেই মানানসই ছিল এবং একটা বিশেষ পর্যায়ে নিজের বিনাশের জন্য বস্তুগত নিয়ামকগুলোকেই (material agencies) তারাই সামনে নিয়ে আসে। ব্যক্তি (কারিগর)-কে ভিত্তি করে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো-ছিটানো উৎপাদনের উপায়গুলোকে সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের প্রক্রিয়া হচ্ছে পুঁজির প্রাক-ইতিহাস। শ্রমিকরা যে মুহূর্তে সর্বহারা তথা প্রলেতারিয়েতে পর্যবসিত হয়েছে, যখন উৎপাদনের শর্ত হিসাবে তাদের শ্রম পুঁজিতে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ, যত তাড়াতাড়ি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তত তাড়াতাড়ি শ্রমের আরও সামাজিকীকরণ ঘটেছে এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়েরও আরও রূপান্তর ঘটেছে। তার ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকতর উচ্ছদের প্রক্রিয়া নতুনতর রূপ গ্রহণ করে।' (এঙ্গেলস, ১৮৭৭, পৃ-১২৩)

হস্তশিল্পের যুগে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক ছিল কারিগরেরাই। পুঁজি সঞ্চয়ের সাথে সাথে এদেরই বিনাশ ঘটে পুঁজির মালিকের হাতে, যা হলো প্রথম বিনাশ (negation), এরপরে বিনাশের বিনাশ হলো এই পুঁজিপতিদের বিনাশ। তাই মার্কস

উল্লেখ করেছেন–'এখন যাদের উচ্ছেদ সংঘটিত হবে সে আর নিজের জন্য কাজ করা শ্রমিক নয়, এখন উচ্ছেদ ঘটবে সেই পুঁজিপতিদের যারা নিজেরাই বহু শ্রমিককে শোষণ করে। উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী- পুঁজির কেন্দ্রীভবনই সেটা করে। একজন পুঁজিপতি সর্বদা অন্য অনেক পুঁজিপতিকে বিনাশ করে।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৫০) একজন পুঁজিপতি যে অন্য অনেক পুঁজিপতিকে খেয়ে ফেলে তাকেই আমরা বলি একচেটিয়া পুঁজি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের এবং উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিকীকরণ হয় এবং কমিউনিস্ট ইশতেহারে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুঁজিবাদ এমন একটি শ্রেণির জন্ম দেয় যাঁরা এই ব্যবস্থার কবর খোড়ে (grave-digger)। *দাস ক্যাপিটাল*-এ মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তির চরিত্র ইতিমধ্যেই কার্যত সামাজিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল এবং সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যখন অসংখ্য হস্তশিল্প কারিগরের ব্যক্তিগত শ্রম থেকে উদ্ভূত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া, স্বাভাবিকভাবেই, ছিল দীর্ঘ, হিংসাত্মক এবং কঠিন। তুলনামূলকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তির চরিত্রের রূপান্তর হবে সহজ। কারণ, পূর্বের ক্ষেত্রে, অসংখ্য ছোট ছোট কারিগরদের সম্পদকে হস্তগত করেছিল গুটিকয়েক দখলদার; এখন এই পর্যায়ে অসংখ্য জনতা দখল করবে গুটিকয়েক আত্মসাৎকারীর অধিকার। আর সেটা হবে বিনাশের বিনাশ সূত্র মেনেই।

এবার, এই সূত্রের অন্য একটি উদাহরণ দেখি। এঙ্গেলস দর্শনের ইতিহাসের উদাহরণ নিয়েছেন এই সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এটি বেশ আকর্ষণীয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন–'অথবা আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক: প্রাচীনকালের দর্শন ছিল আদিম, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা বস্তুবাদ। সেইভাবে এই দর্শনের পক্ষে মন (চিন্তা বা ভাব) এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মার মতবাদ এলো। আত্মা, যাকে শরীর থেকে পৃথক করা যায়। তারপরে এই আত্মার উপর অমরত্ব আরোপ করা হলো এবং পরিশেষে এলো একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ। তাহলে প্রাচীন বস্তুবাদের বিনাশ (negate) করে এই ভাববাদ (বা ঈশ্বরবাদ) এসেছিল। কিন্তু দর্শনের অধিকতর বিকাশের ধারায় ভাববাদও অগ্রহণীয় হয়ে উঠল এবং তাকে বিনাশের পথে আধুনিক বস্তুবাদ এলো। পুরনো বস্তুবাদের বিনাশের বিনাশ হলো এই আধুনিক বস্তুবাদ, কিন্তু তা হলেও তা পুরনো বস্তুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, বরং দুই হাজার বছরের দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকশিত জ্ঞান এবং সেইসাথে এই দুই হাজার বছরের সমগ্র ইতিহাসের চিন্তার সারবস্তু এই পুরানো বস্তুবাদের সাথে যোগ করে তাকে একটি স্থায়ী ভিত্তি দিয়েছে এই নতুন বস্তুবাদ। এটি এখন আর শুধু কোনো দর্শন নয়, সহজ ভাষায় এটি একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি

যার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কোন কিছুর ক্ষেত্রে নয় বরং বাস্তব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগ করতে হবে।' (এঙ্গেলস, ১৮৮৭, পৃ-১২৯; It is no longer a philosophy at all, but simply a world outlook which has to establish its validity and be applied not in a science of sciences standing apart, but in the real sciences.) তাহলে দর্শনের ক্ষেত্রেও বিনাশের বিনাশ পথ ধরে আজকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এসেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই। নিউটন বলেছিলেন আলোর কণার ধর্মের কথা যা কিনা 'নিউটন'স পার্টিকেল থিয়োরি অব লাইট' (Newton's particle theory of light) নামে পরিচিত। ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব অর্থাৎ wave theory। তাহলে নিউটনের কণা তত্ত্বকে বিনাশ (negate) করা হলো। কিন্তু এই তত্ত্বকেও নাকচ করে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইন নিয়ে এলেন নতুন কণা তত্ত্ব। এই হলো বিনাশের বিনাশ। কিন্তু এই নতুন কণা তত্ত্ব নিউটনের কণা তত্ত্বকে ফিরিয়ে আনা নয়, বরং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটল গুণগতভাবে এক বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি। পুরনো সব তত্ত্বকেই, এমন কি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকেও, নতুন তত্ত্বের উপযোগী বা অনুসারী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হলো।

পুঁজিবাদের আবির্ভাব ও বিকাশের পর্যালোচনায় কার্ল মার্কস বিনাশের বিনাশ সূত্রটির সারবত্তা (the essence of the law of negation of the negation) থেকে যে প্রস্তাবনাগুলো উপস্থিত করেছেন, তা পয়েন্ট আকারে বলা যেতে পারে :

ক) আদিম সাম্যাবস্থা বাদ দিলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের একের সাথে অপরের মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু আবার বিকাশের ধারায় একের সাথে অপরের গভীর অভ্যন্তরীণ সংযোগও বিদ্যমান। যেমন, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ এবং পুঁজিবাদ প্রতিটি একে অপরের সাথে ছেদ ঘটিয়ে এসেছে, প্রতিটি পর্যায়ের নিজস্ব দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু এই অর্থে সংযোগ আছে যে, প্রতিটি পর্যায় যেমন তার পূর্ববর্তী পর্যায়ের দ্বন্দ্বের পরিণতি, তেমনি সেই পর্যায়ের মধ্যেই তার পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ সম্ভব হয়েছে, বিকাশের উপাদান রয়েছে।

খ) প্রতিটি পর্যায়, তার পূর্বসূরির দ্বন্দ্বের নির্দিষ্ট রূপকে অতিক্রম করে, সেটিকে বিনাশ করে, নতুন পর্যায়ের অন্তর্গত নতুন দ্বন্দ্বের রূপকে সামনে নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমে তার নিজস্ব বিনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যেমন, সামন্ত ব্যবস্থার অধীন ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প যুগের পুঁজির সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াই তার নিজস্ব বিনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

গ) এই পর্যায়গুলি, একে অপরকে বিনাশ করার মাধ্যমে, তাদের অন্তর্গত সাধারণ দ্বন্দ্বের সমাধান করে এবং সেই পথে বিনাশের বিনাশ প্রক্রিয়ায় নতুন ব্যবস্থায় উন্নীত হয় এবং একই সাথে নতুন অপরিহার্য দ্বন্দ্বের রূপান্তর ঘটায়। যেমন, পুঁজির সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায়

নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন উৎপাদন সংঘটন প্রক্রিয়া, নতুন শ্রম-বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা এক দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। একজন কারিগরের নিজস্ব উৎপাদনের হাতিয়ারকে ভিত্তি করে উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল পুঁজি বিনিয়োগ করে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিপন্থি। ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। এই দ্বন্দ্ব নিরসন করতেই হস্তশিল্পী ও কারিগরদের উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করে যে পুঁজিবাদী সমাজ আসল, সেটাই জন্মদিল একদল শ্রমিককে যাদের শ্রম ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই। পুরনো সমাজ উন্নীত হলো নতুন সমাজে, কিন্তু জন্ম হলো নতুন দ্বন্দ্বের–পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশের পথ করে দিয়েছে, অর্থাৎ এ হলো বিনাশের বিনাশ।

এইবার বলা প্রয়োজন যে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই সূত্রের ধারণা যে বিভ্রান্তি তৈরি করে সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

প্রথম কথা : সকলেই খেয়াল করবেন যে, এই সূত্রের দুইটি ধাপ রয়েছে–প্রথম ধাপ বিনাশ, তারপরের ধাপ সেই বিনাশের বিনাশ। আকারগত যুক্তিশাস্ত্র শুধুমাত্র বিনাশের কথা বলে–যেটা একরকমের স্থির (static) ধারণা। কিন্তু মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব যেহেতু এই সত্য বা বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেয় যে, বস্তুজগত সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল, তাই এই সূত্রের দুইটি ধাপ না মানলে বিকাশের গতিকে বুঝানো যাবে না।

দ্বিতীয় কথা : বিনাশ (negation) অর্থ এই নয় যে পূর্ববর্তী পর্যায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন বা একেবারে নির্মূল হয়ে যাওয়া। প্রতিটি বিনাশ একটি নির্দিষ্ট অগ্রগতি চিহ্নিত করে, প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের সাপেক্ষে একটি মৌলিক ও গুণগত অগ্রগতিই ঘটে। এই দুইয়ের মাঝে ধারাবাহিকতা (continuity) আছে, আবার ছেদও (dis-continuity) আছে। প্রতিটি অগ্রগতি পূর্ববর্তী পর্যায়কে বিনাশ করে, কিন্তু একইসাথে পূর্ববর্তী পর্যায়ের দরকারী, অপরিহার্য কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। আকারগত যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী বিনাশ মানেই পরিপূর্ণ বিনাশ, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তা বলে না। এঙ্গেলস *অ্যান্টি ড্যুরিং*-এ বার্লি বীজের উদাহরণ দিয়ে বিনাশের বিনাশ বুঝিয়েছেন। বীজ যদি ঠিক মতো মাটি, পানি এবং আবহাওয়া পায় তবে বীজকে বিনাশ করে চারা তৈরি হয়, আবার চারা বিনাশ পেয়ে ফলবতী গাছ হয়। সেখান থেকে গাছের বিনাশের পর আবার বার্লির বীজ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বীজ একটা নয়, তার পরিবর্তে কয়েকগুণ বেশি বীজ পাওয়া যায়। তারপর এঙ্গেলস বলছেন : 'আমি শুধুমাত্র বিনাশই করব না, আমাকে বিনাশের উত্তোলনও (sublate) ঘটাতে হবে' (I must not only negate, but also sublate the negation)। ইংরেজি শব্দ 'sublate'-[১৩]এর অর্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে এর আভিধানিক অর্থ হলো যা বিনাশের সাথে সাথে অংশত সংরক্ষণও

১৩. এঙ্গেলস জার্মানিতে কি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সেটা অনুমান করা যেতে পারে। তিনি হয়ত 'aufheben' ব্যবহার করে থাকবেন, কেননা হেগেল এই প্রসঙ্গে ঐ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এই জার্মান শব্দের তিনটি অর্থঃ (১) উত্তোলন, (২) উচ্চতর স্তর এবং (৩) জমিয়ে রাখা (store), বাঁচিয়ে রাখা (save), রক্ষা করা (preserve) (জার্মান শব্দের অর্থ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে)

করে-to negate but preserve as a partial element in a synthesis। দ্বন্দ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন 'উচ্চতর ঐক্যে সমন্বয়'। আবার, কেউ লিখেছেন 'পূর্ববর্তী অবস্থা যুগপৎ বিলুপ্ত হয় ও বজায় থাকে'। এঙ্গেলসের ভাষ্য হলো–'আমি যদি বার্লির একটা বীজকে চূর্ণ করি বা একটি শুঁয়োপোকাকে (যার থেকে প্রজাপতি হওয়ার কথা ছিল) পা দিয়ে পিষে দেই, তবে আমি প্রথম কাজটি সম্পন্ন করেছি (অর্থাৎ বিনাশ করেছি), কিন্তু সেই সাথে দ্বিতীয় কাজটিকেও অসম্ভব করে দিয়েছি। কাজেই প্রত্যেক প্রকার অস্তিত্বেরই বিনাশের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রক্রিয়া আছে, বিনাশ হওয়ার প্রক্রিয়া এমন যাতে প্রথম বিনাশ তার পরবর্তী বিকাশের পথকে সম্ভব করে তোলে। যে কোন ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি।' (এঙ্গেলস, ১৯২৫, পৃ-১৩২)

পা দিয়ে বার্লির বীজ বা শুঁইপোকাকে পিষ্ট করে দিলে সেটা বিনাশ (negation), কিন্তু যেহেতু পরবর্তী বিকাশের জন্য কোন কিছু সংরক্ষিত হলো না, তাই সেটা আর বিনাশের বিনাশ হলো না। সোভিয়েতের *এ টেক্সট বুক অব মার্কসিস্ট ফিলসফি* বইতে 'বিনাশের বিনাশ' অধ্যায়ে ঠিক এই কথাই বলেছে যে, কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিনাশ নিজের মধ্যে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিকে যুক্ত করে এবং বাহ্যিক দিক থেকে প্রাথমিক দ্বন্দ্বের মূল রূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফিরে আসে। (লিউস, ১৯৩৭, পৃ-৩৬৪)

কমরেড লেনিনকে বিপ্লবের পর যে নিউ ইকনমিক পলিসি (নেপ) গ্রহণ করতে হয়েছিল তার কারণও এখানেই নিহিত যে, পূর্বের সময়ের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়ে গিয়েছিল। পার্টির ভেতরে 'নেপ'-এর নীতি নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল, অনেকেই মানতে পারেননি। তখন তাদের বিরুদ্ধে এবং নেপের পক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তার অন্যতম ছিল এই নিগেশন অব নিগেশনের তত্ত্বকে ভিত্তি করে। আমরা যে টেক্সট বইয়ের উল্লেখ করেছি সেখানে চতুর্থ অধ্যায়ে এই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা আছে। লেনিনের *এক-পা আগে, দুই-পা পিছে* বইতেও পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্তভ, অ্যাক্সেলরড, প্লেখানভদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে যেভাবে বিপ্লবী লাইনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন 'নিগেশন অব নিগেশন'।

তৃতীয় কথা : আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, এই নিগেশন অব নিগেশনকে ভিত্তি করে যে বিকাশ তা বুঝি খুব মসৃণ এবং সর্বদাই সম্মুখ পানে। তা কিন্তু নয়। তা দ্বান্দ্বিক ভাবনা নয়। ১৯১৬ সালে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রচার-পুস্তিকা-*দ্য জুনিয়াস প্যামফ্লেট*-প্রকাশ করা হয়েছিল। লেনিন সেই প্রচার-পুস্তিকার উপর, তাঁরই ভাষ্য অনুযায়ী, একটি আত্ম-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি লেখেন–'সময় বিশেষে পেছনের দিকে বিশাল উল্লম্ফন ছাড়াই পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ মসৃণ এবং তা সর্বদাই সামনের দিকে অগ্রসর হয় এমনটা ভাবা দ্বান্দ্বিকতাবিরোধী (undialectical), অবৈজ্ঞানিক এবং তত্ত্বগতভাবে ভুল।' (লেনিন, ১৯১৬খ, পৃ- ৩১০) ইতিহাসে এমন নজির আছে। অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্ব রাজা চার্লস-প্রথম কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রাজতন্ত্রের

অবসান ঘটিয়ে পার্লামেন্টের সার্বভৌম অধিকার অর্জিত হয়েছিল ১৬৪৯ সালে। সে তো ছিল রাজতন্ত্রকে খতম করে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন। কিন্তু ১৬৬০ সালে সেই রাজতন্ত্র আবার ফিরে আসে। তেমনি, ফ্রান্সেও ১৭৯৯ সালে রাজতন্ত্রের পরাজয়ের পর যে রিপাবলিক গঠিত হলো, ১৮০৪ সালে রিপাবলিক ভেঙে দিয়ে নেপোলিয়ন নিজেই সম্রাট হয়ে বসেছিলেন। তাই, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের ইতিহাসই একমাত্র পশ্চাদমুখীতার ঘটনা নয় এবং দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিশ্লেষণ অনুযায়ী তা অসম্ভব ঘটনাও নয়।

চতুর্থ কথা : দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই তিনটি সূত্রের কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কিছু বিতর্ক এক সময় সৃষ্টি হয়েছিল। আবার অনেকে প্রথম আর দ্বিতীয় ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করেন। আমরা এঙ্গেলসের ক্রম অনুসরণ করেছি। যে কোন কারণেই হোক স্ট্যালিন দ্বন্দ্বতত্ত্বের উপর প্রবন্ধে 'নিগেশন অব নিগেশন' আলোচনা করেননি। এই নিয়েও অনেকে বলতে চেয়েছেন যে, স্ট্যালিন দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই সূত্রকে মানতে চাননি। স্ট্যালিন কী কারণে সেই সূত্র আলোচনা করেননি তা আর আজকে হয়ত জানা সম্ভব নয়, কিন্তু স্ট্যালিনের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে থাকা দ্বন্দ্বতত্ত্বের যে টেক্সট বইয়ের উল্লেখ আমরা করেছি সেখানে এই সূত্রের উপর একটি অধ্যায় আছে। তাই স্ট্যালিন দ্বন্দ্বতত্ত্বের ঐ সূত্র মানতে চাননি এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সূত্র সম্পর্কে স্ট্যালিনের বিরোধিতা থাকলে ছাত্রদের সিলেবাসে এই তত্ত্ব থাকত না। কাজেই এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই।

সময়ের সাথে মার্কসবাদের উপলব্ধিকে উন্নত করতে হয়

উপরে যা বর্ণিত হলো তাই মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই আমাদের বুঝতে হবে আমাদের দেশের সমাজ, রাজনীতি-অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সার্বিকভাবে আমাদের সমাজের বিকাশের ধারা এবং স্থির করতে হবে বিপ্লবের কর্মসূচি রণনীতি ও রণকৌশল।

আমরা আলোচনা করেছি যে, মার্কসীয় বস্তুবাদ মনে করে কোন কিছু স্থির নয়, অপরিবর্তনশীল নয়। সময়ের সাথে সাথে সমাজের চরিত্র পরিমাণগতভাবে পরিবর্তিত হয়, আবার এই পরিবর্তন একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, গুণগতভাবে ভিন্ন রূপ আসে। আর যখন সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় তখন তার আলোকে পরিস্থিতিকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে মার্কসবাদের উপলব্ধিকেও উন্নত করতে হয়। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সকল নেতৃত্বকেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে হয়েছে, এমন অনেক উদাহরণ আমাদের জানা আছে।

লগ্নি পুঁজি সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা তার উদাহরণ। *দাস ক্যাপিটালে এ* 'পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবণতা' আলোচনা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস বলেছিলেন :

'এখন যারা দখলচ্যুত হবে তারা আর নিজের জন্য কাজ করা শ্রমিক নয়, বরং বহু শ্রমিককে শোষণ করা পুঁজিপতিরা। এই দখলচ্যুতি ঘটবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মের ক্রিয়ার কারণে এবং পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে। একজন পুঁজিপতি সর্বদা অনেক পুঁজিপতিকে শেষ করে। পুঁজির এই কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা বহুসংখ্যক পুঁজিপতির উৎখাত, সহযোগমূলক শ্রম-প্রক্রিয়া, সচেতনভাবে বিজ্ঞানসম্মত কৃৎকৌশলের প্রয়োগ, জমিতে পদ্ধতিগত চাষাবাদ, শ্রমের যন্ত্রগুলিকে রূপান্তরিত করে শুধুমাত্র সমবেতভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমের উপকরণে পরিণত করা, উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে সম্মিলিত ও সামাজিকীকৃত শ্রমের ব্যবহার করে উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে সাশ্রয়ী করে তোলা, বিশ্ববাজারের জালে সকল মানুষকে জড়িয়ে ফেলা এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী রাজত্বের আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন ইত্যাদি একযোগে বিকাশ লাভ করে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা যারা হস্তগত করেছিল এবং নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই পুঁজিপতিদেরই ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, নিপীড়ন, দাসত্ব, অবক্ষয়, শোষণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এর সাথে সর্বদাই সংখ্যার দিক থেকে বেড়ে চলা শ্রমিক শ্রেণি—যারা পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিজস্ব প্রক্রিয়ার কারণেই সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত–সেই শ্রমিকশ্রেণির বিদ্রোহও বৃদ্ধি পায়। যে উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে এবং তারই সাথে সাথে উদয় হয়েছিল ও বিকশিত হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজি, সেই উৎপাদন পদ্ধতির কাছেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় একচেটিয়া পুঁজি। উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন এক বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে তারা তাদের পুঁজিবাদী সংহতির সাথে বেমানান হয়ে যায়। এইভাবে আবদ্ধতা বিদীর্ণ হয়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংকটের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। উচ্ছেদকারীরাই উচ্ছেদের মুখে।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৭৫০)

মার্কসের সময় পুঁজিবাদী বাজার মূলত অবাধ প্রতিযোগিতার (laissez-faire) স্তরে ছিল। কিন্তু পুঁজির কেন্দ্রীভবনের প্রবণতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেই মার্কস সেদিন পুঁজির মনোপলি হয়ে ওঠা এবং আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই প্রবণতা থাকলেও মার্কসের সময়ে পুঁজিবাদ সার্বিকভাবে একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়নি এবং সেই কারণে একচেটিয়া পুঁজির বৈশিষ্ট্যগুলোকে মার্কসের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। কমরেড লেনিন লিখেছেন :

'অর্ধশতাব্দী আগে, যখন মার্কস *ক্যাপিটাল* লিখছিলেন, অবাধ প্রতিযোগিতা তখন বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনীতিবিদদের কাছে একটি "সহজাত নিয়ম" বলে মনে হয়েছিল। কর্তাভজা (official) বিজ্ঞান নীরবতার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মার্কসের কাজগুলিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, যিনি পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতা উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের জন্ম

দেয়, যার ফলস্বরূপ, বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে, একচেটিয়ায় (monopoly) পরিণত হওয়ার দিকে ধাবিত হয়। আজ একচেটিয়া বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা এ সম্পর্কে পাহাড়প্রমাণ বই লিখছেন যেখানে তাঁরা একদিকে একচেটিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদিকে, কোরাসে গলা মিলিয়ে ঘোষণা করছেন যে "মার্কসবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।" কিন্তু ঘটনা হলো "তথ্য" বড় একগুঁয়ে জিনিস, যেমনটি ইংরেজি প্রবাদ বলে, এবং তাই, আমরা পছন্দ করি বা না করি সেগুলিকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। তথ্যগুলি প্রমাণ করেছে যে, একচেটিয়ার আকারে বা তাদের আবির্ভাবের মুহূর্তের বিচারে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলিতে কেবলমাত্র নগণ্য বিভেদ দেখা যায়; এবং উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের ফলে যে একচেটিয়ার উত্থান তা পুঁজিবাদের বিকাশের বর্তমান স্তরে একটি সাধারণ এবং মৌলিক নিয়ম।' (লেনিন, ১৯১৬, পৃ-২০০)।

একচেটিয়া পুঁজির মার্কসবাদসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন কমরেড লেনিন। মার্কস পুঁজির ক্রমাগত কেন্দ্রীভবনের যে কথা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী একসময় পুঁজি চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত অবস্থায় পৌঁছায় যখন ব্যাংক পুঁজি এবং শিল্প পুঁজি একীভূত হয়। লেনিন এই একীভূত পুঁজিকে বলেন 'লগ্নি পুঁজি' (finance capital) এবং দেখান যে, এই লগ্নি পুঁজির জন্ম হওয়ার সাথে সাথে পুঁজিবাদ এক ভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পণ্য রপ্তানি করার সনাতন চরিত্রের বদলে পুঁজিবাদ এখন সর্বত্র লগ্নি পুঁজি রপ্তানি করতে শুরু করেছে এবং এটাই বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লগ্নি পুঁজি (finance capital) এক মৌলিক ধারণা। পুঁজির চরিত্রের এই গুণগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা মার্কসবাদী সাহিত্যে লেনিনের মৌলিক অবদান।

বিভিন্ন দেশে সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং বিকাশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বস্তুগত পরিস্থিতির ভিন্নতা থাকে। বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে অথবা বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি দেশের এই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের রাস্তা খুঁজে নিতে হয়, রাস্তা খুঁজে নিতে হয়েছে। রাশিয়াতে যেভাবে বিপ্লব হয়েছে, চীনে ঠিক সেইভাবে বিপ্লব হয়নি। রাশিয়াতে শুরুতে সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক দেশীয় জার-সরকার এবং তারপর জাতীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। চীনে আবার শুধু দেশীয় সামন্তপ্রভুদের সাথে নয়, একই সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ভিয়েতনামে তো আবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামই সর্বহারার নেতৃত্বে রাষ্ট্রদখলের বিপ্লবী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। কাজেই, এই বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ধারণা মার্কসবাদের উপলব্ধির ভাণ্ডারে জমা হয়, মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এইসব ধারণার কোনটা হয়ত পুরনো ধারণারই সম্প্রসারিত রূপ, কোনটা আবার পুরনো ধারণারই সংযোজিত নতুন মাত্রা, আবার কোনটা হয়ত সম্পূর্ণ মৌলিক অবদান। চীনে বিপ্লব সংঘটিত করতে গিয়ে চীনের রাজনৈতিক

পরিস্থিতির বাস্তবতায় কমরেড মাও-কে দ্বন্দ্বতত্ত্বে 'বিরোধ'-এর (contradiction) ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল, যা আমরা এইমাত্র আলোচনা করলাম,– অ-শত্রুতামূলক বিরোধ (non-antagonistic contradiction) এবং শত্রুতামূলক বিরোধ (antagonistic contradiction)।

আবার, রাশিয়ার বিপ্লবের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে কমরেড লেনিনকে এপ্রিল থিসিস লিখতে হয়েছিল। কেন লিখতে হয়েছিল? পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো যে, তা লিখতে হয়েছিল এই কারণে যে দলের মধ্যে একাংশ এবং দলের বাইরে মেনশেভিকরা ও সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলিউশনারিরা বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদের পুরনো ধারণা নিয়ে বসেছিল। তাদের বিরুদ্ধে দলের সভ্য-সমর্থকদের কাছে বিপ্লবের নতুন পরিস্থিতিতে করণীয় পন্থার যৌক্তিকতা তুলে ধরতেই তিনি এপ্রিল থিসিসের প্রস্তাবনা করেন।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারকে অর্থাৎ সামন্ত রাজতন্ত্রকে হটিয়ে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলিউশনারিরা বুর্জোয়া সরকারের সাথে আপস করলো এবং জনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন সরকারে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে সময় বলশেভিকদের লক্ষ্য কী হবে, রণনীতি-রণকৌশল কী হবে ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁরা তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লো। এই অবস্থায় ১৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিন দেশে ফিরে পেত্রোগ্রাদের রেলওয়ে স্টেশনের ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন, এখন আমাদের আরেকটি বিপ্লব করতে হবে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হবে। মাত্র নয় মাসের ব্যবধানে আরেকটা বিপ্লব! এ ছিল গতানুগতিক ধারণার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোনো শ্রেণির হাতে ছিল, অর্থাৎ নিকোলাস রোমানভের রাজত্বে অভিজাত সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে ছিল। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে, নতুন শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গিয়েছে। এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবের প্রথম, মুখ্য এবং মৌলিক লক্ষণ-বিপ্লবের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-দুই অর্থেই। ততদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। বলশেভিকদের একটা অংশ মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পুঁজিবাদ সেই মাত্রায় বিকশিত হয়নি এবং সামন্তবিরোধী কার্যক্রম সমাপ্ত করে নতুন স্তরে উন্নীত হয়নি। সেই যুক্তিতে তাদের বক্তব্য ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। তাদের যুক্তি ছিল এইসব অপূরিত কাজ সমাপ্ত না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ বিপ্লব, বিপ্লবী পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যান্ত্রিক। যেহেতু মার্কসবাদে সমাজ বিকাশের পর্যায় হিসাবে বলা হয় যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ মূল দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পরেই শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র আসে, অতএব তাঁরা যুক্তি করতে থাকে যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নতুন

সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। তাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় পার্টি সম্মেলনে লেনিনের এপ্রিল থিসিসের ব্যাখ্যা গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে লেনিন বললেন, প্রত্যেক বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই প্রশ্ন না বুঝলে বিপ্লবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ হতে পারে না, নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো বলাই চলে না। তখন বলা হয়েছে বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয় শাসন ক্ষমতায় কোন শ্রেণি আছে প্রধানত তাদের চরিত্র দিয়ে।

প্রধানত, ইউরোপে এবং অন্যত্র কোন কোন দেশে পুঁজির বিকাশের কারণে উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল না করে বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে আর পুঁজির স্বাধীন বিকাশের পথে চলা সম্ভব ছিল না। এই বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। যে বিপ্লবকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, জাপানের মেইজি বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয় পুঁজির স্বাধীন বিকাশের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণিকে লড়াই করতে হচ্ছিল একই সাথে দেশীয় সামন্তশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য। একদিকে এই লড়াই ছিল আপামর জনসাধারণের জন্য জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই, অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই কারণে এই বিপ্লবকে বলা হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, আমেরিকা, আলজেরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি। ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে পৌঁছে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করেছে। কমরেড লেনিন দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই এই বিপ্লবেও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে এগিয়ে আসতে হবে। এই কারণে এই বিপ্লবকে বলা হচ্ছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনে কমরেড মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে যে বিপ্লব হয়েছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবও হবে বুর্জোয়া শ্রেণির পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে। চীনের একটা অংশ ছিল জাপান-ব্রিটিশসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে, অন্য এলাকায় ছিল সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের শাসন। চীনে তাই ডাক দেওয়া হয়েছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যেখানে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ দুটোকেই উৎখাত করা হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক, রীতি-নীতি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে কাজ করা হয়, বুর্জোয়া বিপ্লবের সেসব অসম্পূর্ণ কাজ শ্রমিকশ্রেণিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নতুন উপলব্দির এটিও একটি উদাহরণ।

মার্কসবাদের উপলব্দি তাই কোন স্থির (static) ধারণা নয়-এর উপলব্দি গতিশীল (dynamic), বাস্তবতা বা বস্তুগত পরিস্থিতির সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল। কিন্তু

মনগড়াভাবে নিছক সুবিধা-অসুবিধার বিবেচনায় তত্ত্ব কৌশল বদলাতে গেলে তা হয় সুবিধাবাদ-সংশোধনবাদ। আর চোখ বুঁজে পরিবর্তন না দেখে একই ভাবনায় অনড় থাকলে তা আচ্ছন্ন করে গোঁড়ামিবাদে।

বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রশ্নে বিতর্ক

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবরে যখন জাসদ প্রতিষ্ঠা করা হলো, তারা এপ্রিল থিসিসের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের এই রণনীতিকে কেন্দ্র করে রণকৌশলটা ঠিক ছিল না। আমাদের দল বাসদ ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠাকালে বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে নির্ধারণ করেছে এবং এই নীতির ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামনে প্রধান শত্রু হলো পুঁজিবাদ ও তাদের সহযোগী সাম্রাজ্যবাদসহ সকল প্রতিক্রিয়ার শক্তি, অন্যদিকে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারাশ্রেণির অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টি।

আমাদের দেশের অনেক বামপন্থি দলের তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লবের স্তর এখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? কারণ, তাঁরা মনে করেন আমাদের দেশের পুঁজির স্বাধীন বিকাশ হয়নি, দেশের পুঁজিপতিরা বা বুর্জোয়ারা সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কমিশন এজেন্ট। তারসাথে এখনও পুরোপুরি না হলেও আধা-আধি কিংবা শক্তিশালী অবশেষ নিয়ে দেশে সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে মুতসুদ্দি বুর্জোয়া বা দালাল বুর্জোয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার। এদের উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা আনতে হবে এবং একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে যেতে হবে। অর্থাৎ, তাদের মতে মূল লড়াই দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশে সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও মুতসুদ্দি পুঁজি বিরোধী কার্যক্রমের নিরিখে বিপ্লবের মূল কর্তব্য নির্ধারিত হবে। এই তত্ত্ব থেকে অবশ্যম্ভাবীভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তাহলো আমাদের দেশ কোন স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। কমরেড মাও সে তুং যখন মুতসুদ্দি পুঁজির অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, তখন বলেছিলেন যে, একটা দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেশনের অধীনে থাকে, অর্থাৎ পরাধীন থাকে তখন দেশে দুই ধরনের বুর্জোয়া থাকে–একদল জাতীয় বুর্জোয়া এবং আর একদল মুতসুদ্দি বুর্জোয়া। (In countries under imperialist oppression there are two kinds of bourgeoisie-the national bourgeoisie and the comprador-bourgeoisie. SW, Vol-V, p-327) অর্থাৎ, দেশে মুতসুদ্দি বুর্জোয়ারা আছে বললে স্বীকার করে নিতে হবে যে দেশ পরাধীন। আর এরা তো সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতেই আছে মুতসুদ্দি বুর্জোয়ারা।

অন্যদিকে আমরা বলেছি, ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের নানা সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা থাকলেও এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে।

কারণ, পুঁজিবাদের উত্থানের যুগে বুর্জোয়ারা যে মাত্রায় যতটুকু প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড করতে পেরেছিল এখন তীব্র বাজার সংকটের যুগে কোন পিছিয়ে থাকা দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষে আর উন্মেষের কালের মতো সেইরকম প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করা সম্ভব না। গত শতাব্দীর সূচনা থেকেই পুঁজিবাদ সংকটের যুগে প্রবেশ করেছে। পুঁজিবাদের বাজার আপেক্ষিক অর্থে ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে, বাজারের অস্থিরতা বাড়ছে, অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘন ঘন অতি-উৎপাদনের কারণে মন্দা দেখা দিচ্ছে, পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্কট ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে, উদ্বৃত্ত পুঁজি লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনশীল ফাটকা বাজারে 'অবাস্তব পুঁজি' (fictitious capital) হিসাবে খাটছে যার সাথে বাস্তব অর্থনীতির (real economy) কোন সংযোগ নেই। আর যে বাস্তবতা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট তা হলো এই অবস্থায় পুঁজিবাদ ক্রমশই দিনে দিনে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। আজকে তদের পক্ষে বুর্জোয়া অর্থ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানামুখী আপস না করে উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে আর শাসনব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনা সম্ভব না, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথার্থ অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তৈরি করা সম্ভব না, ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিকাশ এদের হাতে সম্ভব না। ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে এরা মানবতার জয় গান গাইতে পারবে না, আইন-কানুনকে সবার জন্য নিশ্চিত করতে পারবে না, রাজনীতিকে হীন স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। তাই আজকের যুগের বুর্জোয়া শ্রেণিকে দিয়ে তাদের উত্থানের যুগের অঙ্গীকার অনুযায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দিবাস্বপ্ন মাত্র। রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও আর তাদের নেই। জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশকে নিশ্চিত করে, তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে মর্যাদার আসনে বসাতে তারা পারে না। পুঁজিবাদের উন্মেষের কালে, বিশেষত ইউরোপে, ক্লাসিকাল বুর্জোয়ারা যতটুকু করতে পেরেছিল বর্তমান সময়ের বুর্জোয়াদের পক্ষে তেমনটা আর করা সম্ভব না। এমনকি আমরা যদি শিল্প-বিপ্লবের সূতিকাগার ইংল্যান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো যে, ইংল্যান্ডে ১৬৪০-এর দশকে যেটুকু হয়েছিল সেটা ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের ঘটনাবলির তুলনায় নগণ্য এবং ঠিক বিপরীত। ইংল্যান্ডে সংসদে সামন্ততন্ত্রকে পাইকারিহারে বিলুপ্ত ঘোষণা করার কোনো দৃশ্য ছিল না, অভিজাতদের বিরুদ্ধে কোনো সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েনি, কৃষকদের মধ্যে কোনো জমি পুনর্বণ্টন হয়নি। অলিভার ক্রমওয়েল রাজার সামরিক পরাজয়ের সাধনায় ফরাসি বিপ্লবের নেতা রবসপিয়েরের মতোই লৌহ-কঠিন ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃঢ় ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই বিপ্লবী ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। (স্টুর্জা, ২০১৭, পৃ-১৭) মার্কসও ইংরেজ বুর্জোয়াদের সামন্তশ্রেণির সাথে আপস করাকে ইংল্যান্ডের বিপ্লবের রক্ষণশীলতার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'এম. গুইজোটের কাছে ইংরেজ বিপ্লবের রক্ষণশীলতার কারণ একটি বড় ধাঁধা, যার জন্য শুধুমাত্র ইংরেজদের উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার মধ্যে তিনি এর ব্যাখ্যা খুঁজে পান, কিন্তু ইংরেজ বিপ্লবের রক্ষণশীলতার

ধাঁধার উত্তর আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বড় জমির মালিকদের সাথে বুর্জোয়াদের জোট, এটি এমন একটি জোট যা মূলত ফরাসি বিপ্লব থেকে ইংরেজ বিপ্লবকে আলাদা করে, কারণ ফরাসি বিপ্লব জমিকে খণ্ড খণ্ড ভাগে ভাগ করে বড় জমির মালিকানাকে নির্মূল করেছিল।' (মার্কস, ১৮৫০, পৃ-২৫৪)

শ্রমিকশ্রেণির উত্থানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়ারাও খুব দ্রুতই চার্চের সাথে, রাজতন্ত্রের সাথে, সামন্তদের সাথে আপস করে নিয়েছিল। এর বেশ কিছুকাল পরে যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের উত্থান ঘটে তখন তারাই একমাত্র বেশ কিছুদূর পর্যন্ত চার্চের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিল, সামন্ত-ব্যবস্থাকে নির্মূল করেছিল। তাই, পুঁজির ক্ষয়িষ্ণু যুগে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যে সমস্ত স্লোগান বা আশ্বাসের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, তার সবগুলোই যে বুর্জোয়া-আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যয়ী কিন্তু বিপ্লবভীত দোদুল্যমান নব্য ক্ষমতাসীন শ্রেণি ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করেনি তা খুব অপ্রত্যাশিত নয়। এই কাজ আর তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করা সম্ভব না। এরা হচ্ছে যুগের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা মধ্যযুগীয় সামন্তচিন্তা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সাথে আপসকামী নীতিহীন সংস্কৃতিহীন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া।

আমাদের দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুতসুদ্দি বুর্জোয়া বা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া এবং এরা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। আবার কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা অংশ প্রগতিশীল এবং অপর অংশটি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল এই অর্থে যে তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে চায়, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমাপ্ত করতে চায়। তাদের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে স্বাধীনতার পরে বুর্জোয়াদের এই প্রগতিশীল অংশ রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিল– অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই হলো সেই বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশ। তাই তাঁরা এই রণনীতি গ্রহণ করেছিল যে, এই প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সাথে মিলে অসম্পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে এবং সেই পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশের সাথে জোট করে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অংশ নিতে হবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

এই প্রগতিশীলতার মধ্যে প্রগতিশীল উপাদান বলতে তাঁরা কী বুঝান? সেটা হচ্ছে কোন কোন শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসহ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যেমন কোন কোন সংস্থা জাতীয়করণ করেছে। এই কথা উল্লেখ করার কারণ হলো জাতীয়করণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়। অনেকেই জাতীয়করণ করলেই উল্লসিত হন-এই বুঝি সমাজতন্ত্র এসে গেল। আসলে, পুঁজিবাদের স্বার্থেই বা বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থেই অনেক পুঁজিবাদী দেশই কখনো কখনো কোন কোন শিল্প-

কারখানা জাতীয়করণ করেছে। তার সাথে হয়ত এইসব দল আশা করে যে, সরকার যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহনীয় পর্যায়ে কিছু অবস্থান নেয় বা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে তবে সেটাই প্রগতিশীল বুর্জোয়ার লক্ষণ। যাই হোক, তাদের মতে এই বুর্জোয়াশ্রেণির সাথে যদি বামপন্থিরা এবং কমিউনিস্টরা যুক্ত হয় তা হলে প্রগতিশীল অংশের হাতকে শক্তিশালী করা হবে, শ্রমিকশ্রেণি তাদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে পারবে, তাদের অধিকার বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চে নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে। সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে একসময় বুর্জোয়া একনায়কতান্ত্রিক বাকশাল সরকারেও তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য সেটা যে ভুল পদক্ষেপ ছিল তা তাঁরা স্বীকার করছেন। তবে এখনো রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে এবং বিশ্লেষণে আমাদের সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই কারণে, আমাদের অবস্থানের সাথে তাদের অবস্থানের পার্থক্য রয়েছে।

অন্যদিকে, পিকিংপন্থি নামে যাঁরা চিহ্নিত ছিলেন তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মুতসুদ্দি বুর্জোয়া মানে সাম্রাজ্যবাদের কমিশন এজেন্ট। এরা স্বাধীন বুর্জোয়া নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করার বিনিময়ে সুবিধা ভোগ করে, কমিশন ভোগ করে। যাঁরা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করে- তাঁরা হচ্ছে স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া। স্বাধীনতার পর থেকে যাঁরা শাসন ক্ষমতায় এসেছে বা আছে তাঁরা কেউ জাতীয় বুর্জোয়া নয়। এরা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক দেশীয় দালাল বুর্জোয়া যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। আমরা বলেছি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এরা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিকেই প্রতিনিধিত্ব করেছে। এদের প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব কিছু মিলে এরা বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে ও স্বার্থে প্রধানত রাজনীতি করে। তাঁরা পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তাদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রকে সেভাবে পরিচালিত করে। শুরুতে মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদের বক্তব্য অন্যদের কাছে সুস্পষ্ট করা কঠিন ছিল। এখন বামপন্থিদের অনেকেই বিষয়টা খুব সহজে ধরতে পারছেন। তবে এখনো অনেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন ত্যাগ করতে পারছেন না, কেউ কেউ মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁরা জনগণের সামনে বোধগম্যভাবে হাজির করতেও পারছেন না, কারণ বাস্তবতার সাথে তাদের বিশ্লেষণের কোন মিল নেই।

এই যে এখনো কেউ কেউ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, কেউ আবার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের তত্ত্ব, কেউ কেউ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদির কথা বলছেন সেটা সাধারণ মানুষের কাছে যৌক্তিক প্রতিপন্ন হচ্ছে না। কারণ, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন

এবং সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারেন। প্রথমত : আজকের বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কর্পোরেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বুঝতে হলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্যটা বুঝা দরকার। লেলিন তার একাধিক রচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখালেন, ব্যক্তি মালিকানা এবং উদ্বৃত্ত শোষণ—এই দুই ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সাদৃশ্য থাকলেও জমির মালিকানার চরিত্র, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা শক্তির অবস্থা—এই চারটি বিষয়ে দুই ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমানে শহরে এবং গ্রামে সর্বত্রই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতেই উৎপাদন হয়, কোথাও সামন্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে হয় না। বাংলাদেশের গ্রাম বা শহর কোথাও উৎপাদনের উদ্দেশ্য কি উৎপাদকের ব্যক্তিগত ভোগ, মুনাফা অর্জন না? উৎপাদকরা কি উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির জন্য কৃষি-উৎপাদন সংগঠিত করে না? বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক শোষণের রূপ তা কি খাজনা (rent) নির্ভর? বাংলাদেশের কোন গ্রামে কি আজ এমন ভূমিদাস আছে যাঁরা জমির সাথে বাঁধা পড়ে আছে, যাঁরা স্বাধীনভাবে অন্য পেশায় বা জীবিকায় যেতে পারেন না? দেশের মধ্যে তো বটেই কাজের অভাবে জীবিকার জন্য বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ। এরা সকলেই মুক্ত মজুর (free labour), আজ কোন সামন্ত সম্পর্কই নেই তাদের আটকে রাখতে পারে।

অনেকে দাবি করেন আমাদের কৃষিতে বর্গাপ্রথা আছে এবং তার উদাহরণ তুলে সামন্তীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি করেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চলেছে। কিন্তু তাঁরা এই দৃশ্যমান বাস্তবতা দেখতে পান না যে, এখন বর্গাপ্রথা আগের মতো চিরায়ত চরিত্রের বাধ্যতামূলক নয়। বর্গাপ্রথা এখন আগের চরিত্র পাল্টে চুক্তিভিত্তিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কৃষক জমির মালিকের সাথে দরকষাকষি করে, চুক্তি করে। কে কত বিনিয়োগ করবে, উৎপন্ন ফসলের কে কত অংশ পাবে সেসব বিষয়গুলো আগে স্থির হয় এবং তার ভিত্তিতে কৃষক জমি বর্গা নেয়। যদি বর্গাচাষির লাভের সম্ভাবনা থাকে তবে সে জমি চাষ করে, আর তা না হলে সে করে না। সবচেয়ে প্রধান বিষয় জমির মালিক কৃষককে চাষ করতে বাধ্য করতে পারে না। কোন গ্রামেই সেই বাস্তবতা নেই। এই প্রকার যে চুক্তিভিত্তিক বর্গা চাষ তা কোন সামন্ত বৈশিষ্ট্য নয়, সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কও নয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্য জনক ঘটনা যে যাঁরা কৃষিতে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনের উদ্দেশ্য খুঁজে পান তাঁরা আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন না। তা হলো এখন যেভাবে জমি লিজ নিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই ব্যবস্থায় একজন পুঁজির মালিক ছোট কৃষকের কাছ থেকে তাঁর জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ নেন। ছোট কৃষককে কত টাকা বা লিজ-মানি দেবেন তা স্থির হয়। ওই ছোট কৃষক যদি বুঝেন যে, তাতে তাঁর লাভ আছে তবে তিনি তাঁর জমি নগদ টাকার বিনিময়ে পুঁজির মালিককে ব্যবহারের জন্য দেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তির ভিত্তিতেই এই কাজটা হয়। এই ব্যবস্থা তো সরাসরি কৃষিতে পুঁজির প্রবেশই বুঝায় এবং পুঁজির মালিক মুনাফার উদ্দেশ্যেই

তার পুঁজি কৃষিতে বিনিয়োগ করেন। এর মধ্যে কোথায় সামন্ত সম্পর্ক তাঁরা খুঁজে পান? তাদের বিশ্লেষণের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে আরেকটা কথাও তাঁরা বলেন যে, কৃষিতে মাসভিত্তিক বা বছরভিত্তিক কৃষককে জমিতে কাজ করানোর প্রথা এখনো অব্যাহত আছে। এটাকেই তাঁরা বলতে চান বাধ্য শ্রমের প্রথা। আমরা বলছি, এখন আর এরকম বাধ্যশ্রম ব্যবস্থা চালু নেই। আর যদি মাসভিত্তিক, বছরভিত্তিক মজুর হিসাবে কাউকে নিয়োগ করাও হয় এবং সেই কৃষকের যদি মাসিক বা বাৎসরিক সময় অতিক্রান্তের পর প্রয়োজনে অন্যত্র কাজ খুঁজে নেওয়ার অধিকার থাকে, তবে সেটাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মালিক-মজুর সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সামন্ত সম্পর্ক বুঝায় না।

দ্বিতীয়ত : আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সামন্তবাদে উৎপাদন হয় ভোগের জন্য আর পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় মুনাফার জন্য। শহরের পণ্য উৎপাদনের কল-কারখানা বা সেবামূলক পণ্য উৎপাদনের সংস্থা সর্বত্রই উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য যেমন হলো মুনাফা করা, তেমনি আজকে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রেও মূলত, উৎপাদন হয় মুনাফার জন্য, শুধুমাত্র ভোগের জন্য নয়। এই মুনাফা তো শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করেই একমাত্র করা সম্ভব। গ্রামে এবং শহরে সর্বত্রই এই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই পুঁজির সঞ্চয়ন (accumulation of capital) ঘটছে দেশে। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেই পুঁজি যতটুকু সুবিধা-সুযোগ আছে তার ভিত্তিতে অন্যত্র বিনিয়োগ হচ্ছে।

তৃতীয়ত : কৃষিক্ষেত্রে যা উৎপন্ন হয় তা বর্তমানে সামন্ত আমলের মতো স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপন্ন হয় না, স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য চাষ হয় না। উৎপন্ন হয় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য। কৃষকরা যে চাল উৎপাদন করে তাও আজ জাতীয় বাজারের পণ্য। উৎপাদিত ফসলের যেটুকু তাঁর ভোগের জন্য লাগে তার অতিরিক্ত অংশ সে বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রি করে। এটাতো সামন্ত ব্যবস্থার লক্ষণ না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, চাল বাংলাদেশের যে কোন বাজারে বিক্রি করা যায় এবং যেখানে বেশি দাম পাওয়া যায় সেখানেই সেই চাল চলে যায়। কিন্তু সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলে যে কোন বাজারে সেটা বিক্রি করতে পারে না, তা জাতীয় বাজারের পণ্য হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সামন্ত সমাজে আজকের মতো জাতীয় বাজারই থাকে না। জাতীয় বাজার গড়ে ওঠাই পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য, যে চালটা কৃষক ভোগ করে আবার পণ্য হিসেবে বিক্রয়ও করতে পারে, এ কারণে এটা সম্ভাবনাময় পণ্য। গ্রামের যে কোন কৃষিজাত পণ্যই আজকে স্থানীয় ভোগের চাহিদা মেটানোর জন্য বসে থাকে না, যেখানে দাম বেশি পায় সেখানেই সে পৌঁছে যাচ্ছে। আজ দেশে যত চওড়া রাস্তা-ঘাট হচ্ছে, ব্রিজ হচ্ছে, রেলের নতুন লাইন বসছে দেশের সাধারণ মানুষ এক ধরনের জাতীয়তাবোধে উৎফুল্ল হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, এইসব গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য বুর্জোয়াদের জাতীয় বাজারের সম্প্রসারণের দাবিপূরণ। কাঁচা মালের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামের সাথে যেমন সংযোগ স্থাপন প্রয়োজন, তেমনি উৎপাদিত পণ্যকে সহজে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে আরও বেশি বেশি ভোক্তার কাছে নিয়ে যাওয়ার

সুবিধা তৈরি করাও প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্য রপ্তানির উপায়কে প্রশস্ত করাও প্রয়োজন। যত এইসব পরিকাঠামো গড়ে উঠছে তত দ্রুত এইভাবে জাতীয় বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হচ্ছে বটে, তবে সেটা বাই-প্রোডাক্ট মাত্র। 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বাজার ২০১৬ সালে ছিল ৩ হাজার ৪৯২ কোটি ডলার, যা সম্প্রসারিত হয়ে ২০২১ সালে হয়েছে ৪ হাজার ৭৫৪ কোটি ডলার। আমাদের সমগ্র পণ্য-উৎপাদন ক্ষেত্রের ১৩ শতাংশ হচ্ছে খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ। উৎপাদন শিল্পের মোট শ্রমিকের ৬.৫ শতাংশ এই শিল্পের সাথে যুক্ত। 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'-র তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন কৃষিজ এবং খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকৃত প্রায় ৭০০ পণ্য পৃথিবীর ১৪০টি দেশে রপ্তানি করে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন যদি সামন্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে শুধুমাত্র ভোগের ও স্থানীয় বাজারের বেচাকেনার জন্য হতো তাহলে এইভাবে কৃষি পণ্যের বাজার গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

যদিও, পিকিংপন্থি বলে যাঁরা পরিচিত এবং যাদের তত্ত্বে জাতীয় বুর্জোয়ার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাদের যুক্তির উত্তরে কৃষিতে পুঁজিবাদ প্রবেশ করেছে কী করেনি সেই আলোচনা দিয়ে বুর্জোয়াদের শ্রেণিচরিত্র যে মুতসুদ্দি নয় তা প্রমাণ করা যায় না। তার জন্য বাংলাদেশের শ্রেণিগঠন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত দেশের এবং বিদেশের যাঁরা যাঁরা এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কি প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণি গঠিত হয়েছে তা দেখিয়েছেন এবং তাঁরা কেউ এই সিদ্ধান্তে আসেননি যে, বাংলাদেশের বুর্জোয়ারা মুতসুদ্দি চরিত্রের। এই কথা ঠিক যে, যখন মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তখন দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণি খুবই দুর্বল ছিল এবং তাদের একাংশ বিদেশী পুঁজিপতিদের কমিশন এজেন্ট হিসাবেই শুরু করেছিল। যাঁরা মুতসুদ্দি পুঁজির পক্ষে সওয়াল করেন তাদের যুক্তি অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ডায়ালেকটিক্যাল নয়। দ্বান্দ্বিকতার মূল কথাই হলো কোন কিছুই স্থির নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। মুতসুদ্দি পুঁজি চিরকালই মুতসুদ্দি থাকে না। পুঁজির সঞ্চয়নের সাথে সাথে তাদের চরিত্রও পাল্টায়। যেমনভাবে *দাস ক্যাপিটাল* এ মার্কস দেখিয়েছেন, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে অনেক ছোট ছোট গিল্ড-প্রভু এবং তার চেয়েও বেশি স্বাধীন ক্ষুদ্র কারিগর, এমনকি কোন কোন মজুরি শ্রমিক, নিজেদেরকে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করেছিল এবং ক্রমশ মজুরি শ্রমের শোষণের সুযোগ নিয়ে সেই অনুসারে পুঁজির সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পরিপূর্ণ পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছিল। যাঁরা যাঁরা বাংলাদেশের শ্রেণি গঠন নিয়ে বা যাঁরা 'উন্নয়নের সাথে শাসনতন্ত্র' আলোচনার প্রসঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব নিয়ে কাজ করেছেন তাদের গবেষণায় এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়েছে।[১৪] এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই, অন্যত্র

১৪. Manzurul Mannan (1990), 'The State and the Formation of a Dependent Bourgeoisie

কখনো করা যাবে। তবে দুটো কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো। (এক) অনেকেই দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্লেষণে ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসের সাথে অসঙ্গতির প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র বুঝতে চান, যা স্থান, কাল ও বস্তুগত পরিস্থিতির বিচারে একেবারেই মার্কসবাদসম্মত নয়। (দুই) এই কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতায় অর্থনীতি এখনও শক্তিশালী শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকে ভিত্তি করে নয় এবং সেই বিচারে অনেক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সর্বত্রই বিরাজমান। বাংলাদেশের পুঁজিবাদের উন্মেষের কালের বাস্তবতা আমাদের মনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের পুঁজির উত্থানপর্বের উদাহরণ দিয়ে বিচার করা হবে চূড়ান্তভাবে মার্কসবাদ বিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক। পুঁজিবাদের লগ্নি পুঁজির যুগে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপ, যে হারে উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটছে তার তুলনায় বাজার সম্প্রসারণের হার কম হওয়ায় পুঁজি বিনিয়োগের লাভজনক ক্ষেত্রের অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, অত্যাধুনিক কৃৎকৌশলের সহজপ্রাপ্তি (access) না থাকা এবং তুলনামূলকভাবে পুঁজির দুর্বল ভিত্তি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়েই বিশ্লেষণ করা মার্কসবাদসম্মত। কারণ কোন কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে দেখা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি না।

কেন এই কথাগুলো বলছি? কারণ, কেউ কেউ দেশের পুঁজির নির্ভরতার প্রশ্ন তুলে মুতসুদ্দি চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। আগে বাংলাদেশের কথিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ)-এর বৈঠক হতো প্যারিসে। বাংলাদেশের উন্নয়নের কৌশল, পরিকল্পনা, অর্থায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো প্যারিস কনসোর্টিয়ামে। '৮০-র দশকের একটা সময় পর্যন্ত বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন তদবির করার ও অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ জানার জন্য। ওয়েস্টারগার্ড দেখিয়েছেন যে, ১৯৮০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তার বিনিয়োগের ৬০ শতাংশ, তার উন্নয়ন বাজেটের ৮৫ শতাংশ এবং তার পণ্য আমদানির ৬৩ শতাংশ অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল'। (ওয়েস্টারগার্ড, ১৯৮৫, পৃ-১০২)

এখন আর অবস্থা আগের মতো নয়। যদিও যে পদ্ধতিতে বেসামরিক থেকে সামরিক-আমলাতন্ত্রের অধীনে তাদের ঘনিষ্ঠজনেরা সাধারণ মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে রাতারাতি বুর্জোয়াশ্রেণির চরিত্র অর্জন করেছিল তাকে 'লুটেরা বুর্জোয়াশ্রেণি' বা 'Bandit Capitalism' বলা চলে। মুক্তিযুদ্ধের পরেই পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের ফেলে যাওয়া শিল্প-কলকারখানা সরকারের রাষ্ট্রীয়করণের ফলে মোট শিল্প-সম্পদের প্রায় ৯২ শতাংশ ছিল সরকারি। কিন্তু ৭২-৭৫ বেসামরিক শাসনামলে ক্ষুদ্র পরিসরে

in Bangladesh'; David Lewis (2011), 'Bangladesh: Politics, Economy and Civil Society'; S. Nazrul Islam (2016), 'Governance for Development: Political and Administrative Reforms in Bangladesh'; Rehman Sobhan (1980), 'Growth and Contradiction within the Bangladesh Bourgeoisie'

বেসরকারিকরণ শুরু হলেও সামরিক-আমলাতন্ত্রের অধীনে সেই শিল্প-কলকারখানা বেপরোয়াভাবে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে দেশের ধনীগোষ্ঠীর উদ্যোগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সামরিক সরকার আমলে অকাতরে তাদের জনগণের টাকা লুট করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৫-৮১ সালের মধ্যে ৯৬ শতাংশ সরকারি অর্থ এদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। এই অর্থ এসেছিল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ওয়েস্ট জার্মান ব্যাংক থেকে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ১০-১৪ শতাংশ নিজস্ব পুঁজি থাকলেই বাকি অর্থ সরকার জোগান দিয়েছে, যা জনগণের টাকা। ঐ সময়ে যে ৪০৮টি সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র ৫.৯ শতাংশ ঋণ পরিশোধ করেছিল, ২৭.৫ শতাংশ সুদের এক টাকাও দেয়নি, ৪২.৫ শতাংশ ঋণের ১০ শতাংশেরও কম ফেরত দিয়েছে। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ে এই দস্যুতার ইতিহাস থাকলেও এরাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের পুঁজির বিকাশের আরেকটি চিত্র বুঝা যায় যেখানে স্বাধীনতার পর '৭২ সালে বাংলাদেশে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ সীমা ছিল ২৫ লক্ষ টাকা '৭৪ সালের ১৬ জুলাই সেই সিলিং বাড়িয়ে করা হয় ৩ কোটি টাকা। পর্যায়ক্রমে '৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর প্রথমে বৃদ্ধি করা হয় ১০ কোটি টাকা এবং পরে সিলিং তুলে দেয়া হয়। একই রকমভাবে স্বাধীনতার পর '৭২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী দেশে কোটিপতি ছিল ৫ জন, ১৯৭৫ সালে তা ৪৭ জনে উন্নীত হয়। ১৯৮০ সালে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ৯৮টি। এরপর ১৯৯০ সালে ৯৪৩টি, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪টি, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭টি এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৯ হাজার ১৬৩টি। ২০২০ সালে ডিসেম্বরের শেষে দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বেড়ে এক লাখ এক হাজার ৯৭৬টিতে পৌঁছায়। এ সকল ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সব সরকারই সর্বোত্তমভাবে পুঁজির স্বার্থ ও পুঁজির বিকাশে ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এরা জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকেই প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের দেশের বুর্জোয়াদের চরিত্র বিশ্লেষণে তার উন্মেষকালের ঐতিহাসিক শর্তাবলিও বিবেচনা করতে হয়। পৃথিবীতে বুর্জোয়ারা প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সময় সপ্তদশ শতাব্দীতে। মার্কসের *দাস ক্যাপিটাল*-এ উল্লেখ করা হয়েছে 'রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলাফলকে সুসংহত করার জন্য, ১৬৫৩ সালে স্টেট কাউন্সিলের নেতৃত্বে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল।'[১৫] তারপর থেকে পুঁজিবাদ তার অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পার হয়ে কয়েক শতাব্দী পর পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে লগ্নি পুঁজির যুগে প্রবেশ করেছে, মনোপলি ক্যাপিটালের জন্ম দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, দুই-দুটো মনুষ্যঘাতী মহাযুদ্ধে লিপ্ত

১৫. রচনাবলি, খণ্ড-৩৫, নোট- ৬৫৩, পৃ- ৮০৬

হয়েছে। সর্ব-অর্থে পুঁজিবাদ তখন ক্ষয়িষ্ণু, মরণোন্মুখ, সংকটগ্রস্ত। এমন একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। সেই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে পুঁজির উত্থানের যুগের ক্ল্যাসিক্যাল চরিত্র আশা করার অর্থ অ-মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার প্রকাশ। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের সমস্ত চিহ্ন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। দখল-লুটপাট, দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি ইত্যাদি তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবেই আছে। শাসকদল ও আমলাতন্ত্রের সাথে যোগসাজসে সরকারি জমি দখল, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রতারণা, দস্যুবৃত্তি দেশের স্বাভাবিক নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে। শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের প্রায় দুই শত বছর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশমান সকল দেশের বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেই তা কম-বেশি সত্য। যেমন, রাশিয়ার বুর্জোয়াদের সম্পর্কে ১৮৮২ সালে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন 'রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বিকাশমান পুঁজিপতি প্রতারক এবং বুর্জোয়া' (rapidly developing capitalist swindle and bourgeois)। আবার এটাও সত্য যে, এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বাইরে কোন পুঁজিবাদই টিকে থাকতে পারে না, পারস্পরিক নির্ভরতা সাধারণ নিয়ম। এখানে দরকষাকষি যেমন থাকে তেমনি অসম লেনদেনের গাঁটছড়াও থাকে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সত্য যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে যাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে বাংলাদেশের বুর্জোয়াদের কোন অংশ প্রগতিশীল আর কোন অংশ প্রতিক্রিয়াশীল। আর যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে বাংলাদেশের বুর্জোয়াদের কোন অংশ মুতসুদ্দি আর কোন অংশ জাতীয়। কারণ, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, বাস্তবে দেশ পরাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নিষ্পেষণের মধ্যে রয়েছে, তাহলেও বুর্জোয়াশ্রেণির সকলেই মুতসুদ্দি তেমন কথা মাও সে তুং বলেননি। বলেছেন জাতীয় বুর্জোয়াদের পাশাপাশি একটা অংশ মুতসুদ্দি থাকে। আমাদের দেশের বর্তমান বুর্জোয়া শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবির নিরিখে তথ্য সহকারে এমন বিভাজন করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব হবে?

এখন কথা হলো, বুর্জোয়াশ্রেণিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন, এদের কোন এক অংশের সাথে একীভূত হয়ে কিংবা ছোট শরীক হিসাবে ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে যৌথভাবে ফ্রন্ট গঠন করে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। বাস্তবে যৌথভাবে ফ্রন্ট গঠনের এমন প্রস্তাব চূড়ান্ত হাস্যকর। সমাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত করা যাবে না। কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থের প্রেক্ষিতে আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণির সেই অ্যাজেন্ডাই নেই তো বাস্তবায়ন করবেন কী করে? এই যদি হয় উপলব্ধি তা হলে বিপ্লবের স্তর নিয়ে বিভ্রান্তিতে না ভুগে, আমাদের বিবেচনায় বিপ্লবের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে

অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই বিভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব। যারা সংগঠনের নামের সাথে জাতীয় মুক্তির কথা রেখে শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলছেন সেটাও চিন্তা ও কাজে অসঙ্গতি তৈরি করে। মূল কথা হলো এদের অনেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না, করণীয় কী তা স্থির করতে পারছেন না, এদের তত্ত্বের সাথে বাস্তবতার এত গরমিল হচ্ছে যে রণনীতির সাথে রণকৌশলের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ যেহেতু তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করেন বুর্জোয়াদের মধ্যে একাংশ প্রগতিশীল, সেহেতু আওয়ামী লীগকে তাদের প্রতিনিধি মনে করে কখনো তাদের সাথে জোট করছেন বা সরকারে যাচ্ছেন। তারপরেই আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল, জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করতে না পেরে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাদের দুর্বলতা লক্ষ্য করে বাংলাদেশে আরও অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং এখনো অব্যাহত আছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশে কি শক্তিশালী পুঁজিবাদ আছে? এখানে কি শ্রেণি হিসাবে শ্রমিকেরা বিকশিত হয়েছে? তাহলে, এখানে কোন শ্রেণি বিপ্লব করবে? বিপ্লব পূর্ব রাশিয়াতেও একই প্রশ্ন উঠেছিল, কারণ তদানীন্তন রাশিয়াও ছিল কৃষি নির্ভর দেশ এবং সেই কৃষিও ছিল প্রায় আদিম অবস্থায়। অর্থাৎ ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় রাশিয়া অনেক পিছিয়ে ছিল। শিল্প প্রায় ছিলই না বা সদ্য বিকশিত হচ্ছিল এবং সেই কারণে বিশালাকৃতি রাশিয়ার তুলনায় শ্রমিকশ্রেণি দেশের সর্বত্র বিকশিত হয় নাই এবং যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে উপস্থিত ছিল না।

এখানে যেটা দেখা দরকার যে, এখন সমাজে অগ্রসরমান শ্রেণি কোনটা? শ্রেণিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে অগ্রসরমান শ্রেণি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষকসহ অন্যান্য পাতি-বুর্জোয়াদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার কাজটা করবে। সর্বহারাশ্রেণির পার্টি হবে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী লড়াইয়ের হাতিয়ার। সর্বহারাশ্রেণির পার্টিটা কেমন, এর বৈশিষ্ট্য কী, চরিত্র কী? বুর্জোয়াশ্রেণি যে ধরনের রাজনৈতিক শক্তি, সাংগঠনিক কাঠামো, দল পরিচালনার সক্ষমতা, নীতিমালা ও হাতিয়ার দিয়ে সামন্তবাদকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল, সেদিনের তুলনায় অনেক অগ্রসর চেতনা, অধিক সংগঠিত শক্তিশালী হাতিয়ার, উন্নততর বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা দল ছাড়া সর্বহারাশ্রেণির উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। বুর্জোয়ারা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিল। সেই ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তারা স্লোগান তুলেছিল সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা। আওয়াজ তুলেছিল গণতন্ত্র-সেক্যুলারিজম ও নারীমুক্তির। কিন্তু তাঁরা কোথাও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কেন পারেনি? কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলে সমাজে সাম্য আসবে না। আবার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে সাম্যের যত স্লোগান দিক তাতে বৈষম্য দূর হবে না, সমতাবিহীন সমাজে সমমর্যাদা স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে না।

শ্রমিক শ্রেণির দল কেমন হবে?

আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল কেমন হবে? আমরা ধারণা নিয়েছিলাম কমিউনিস্ট লিগের ঘোষণাপত্র ও ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার থেকে। কাল মার্কস যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছিলেন, যে আদর্শগত চেতনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সামন্ত বা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে বুর্জোয়ারা বিপ্লব করেছিল, যেমন প্রকৃতির দল গঠন করেছিল ওই প্রকৃতির দল দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির চলবে না। শ্রমিকশ্রেণির দল করতে হলে শ্রেণি-চেতনার ভিত্তিতে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লাগবে যা গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তিতে। সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সর্বহারাশ্রেণির রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং চিন্তা-চেতনা। আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগের জন্য যে শ্রেণিসংগ্রাম, তার অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে তোলা বিশেষ রাজনৈতিক শিক্ষা ও শ্রেণিচেতনাই দলের আদর্শগত ভিত্তি। *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এ পরিষ্কারভাবে বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। *কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র* বই-এর প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকাতে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যে আধুনিক শ্রেণি সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ কেবলমাত্র দ্বন্দ্বতত্ত্বের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল।' পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বন্ধনে যৌথচেতনায় শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথনির্দেশও তাঁরা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমেই সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী দলের আদর্শগত চেতনা ও সাংগঠনিক বোধ সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছিল। সংগঠনের বিকাশের ধারাবাহিকতায় লেনিন মেনশেভিকদের সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে দেখান *কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি*, যা ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়, যেখান থেকে আমরা শিক্ষা পাই। একই সাথে বিশ্বের দেশে দেশে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছিলেন, বিপ্লব পরিচালনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে মার্কসীয় বিপ্লবের ধারণাকে সমৃদ্ধ ও বিশেষীকৃত করে গেছেন—সবই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। যেমন, লেনিন-স্ট্যালিন তাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণির দলের পরিচালনায় বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া একদল পেশাদার বিপ্লবীর কাজ। এমন একদল পেশাদার বিপ্লবী যাঁরা দলের স্বার্থের সাথে নিজের স্বার্থকে একীভূত করে দেবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং তার সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের এইসব অমূল্য অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাই হলো আমাদের দল গড়ে তোলার ভিত্তি। তার সাথে সংযোজিত হয়েছে আমাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিশেষ রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের নিজস্ব সংগ্রামী অভিজ্ঞতা। দলের আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের সাথে যেমন যেমনভাবে সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ হয়েছে, তেমন তেমন ভাবেই তাদের সংগ্রামী

অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের উপলব্ধিরও নিত্য নতুন সম্প্রসারণ ঘটেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা শ্রেণিহীন, বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য বিপ্লব সংগঠিত করতে দল গড়ে তুলেছি। আমরা সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল গড়ে তুলতে চাই, তার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে চাই। এই অবিরাম সংগ্রাম থেকেই আমাদের দলের কর্মীদের মধ্যে ইস্পাত-দৃঢ় কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে উঠবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সর্বহারার নীতি-নৈতিকতাকে ভিত্তি করে দল ও দলের কর্মীরা গড়ে উঠবে। কার্ল মার্কস সেই শিক্ষা দিয়েছেন, এঙ্গেলস সেই শিক্ষা দিয়েছেন। এই আদর্শকে ভিত্তি করে আগামী দিনে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ হবে, সেই সমাজের একটা প্রতিফলন ঘটতে হবে এই দলের সদস্য, কর্মী ও সমর্থকদের আচার, আচরণ, বিশ্বাস ও জীবন-যাপনের মধ্যে। সকালের শিশির বিন্দুতে যেমন করে সূর্য প্রতিফলিত হয়, তেমনভাবে যে সমাজ সর্বহারাশ্রেণি নির্মাণ করবে তার প্রতিফলনও একটি সঠিক বিপ্লবী দলে দেখা যেতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো সেটা কেমন? সেখানে থাকতে হবে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা যৌথ বন্ধন। এখানে ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বিপ্লবী সহমর্মিতার নিদর্শন আলো ছড়াবে। কীভাবে হবে? যতক্ষণ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি থাকবে ততক্ষণ এটা হবে না। সম্পত্তি নানা সূত্রে কার কতটা আছে কিংবা নাই, তার চেয়ে বড় কথা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যে আজকের দিনে অন্যায়-অসাম্য-বৈষম্যের কারণ সেটা স্বীকার করি কিনা? ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণা থাকতে হবে। ইতিহাসে একসময় ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায়। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে কোন সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা ছিল না, সব সম্পদের উপর ছিল গোষ্ঠী মালিকানা। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে এই সমস্ত গোষ্ঠীতে নিজেদের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের পরও কোন কোন জিনিস অতিরিক্ত থাকছিল। সেই অতিরিক্ত অংশ তাই প্রাথমিকভাবে গোষ্ঠীপতিরা দুই গোষ্ঠীর সীমান্তবর্তী অংশে বিনিময় করা শুরু করলেও, বিনিময় প্রথার প্রসারের জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ব্যক্তি মালিকানা। *দাস ক্যাপিটাল*-এ মার্কস এই সামাজিক বাস্তবতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন–'কোন একটি উপযোগী বস্তু বিনিময়-মূল্য অর্জনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারে তখনই যখন সেটি তার মালিকের কাছে আর ব্যবহার মূল্য নেই, কিন্তু তা ঘটতে পারে তখনই যখন সেটি মালিকের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত কোন অংশ। জিনিস হিসাবে সেগুলো মানুষের কাছে বাহ্যিক এবং ফলস্বরূপ তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। (বিনিময়ের দুই পক্ষের কাছে) যাতে এই বিচ্ছিন্নতা পারস্পরিক হতে পারে, সেইজন্য যা প্রয়োজন তা হলো পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে ঐ বিচ্ছিন্ন জিনিসগুলির ব্যক্তিগত মালিক হিসাবে এবং তার অর্থ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা। কিন্তু সম্পদের উপর গোষ্ঠী মালিকানা ভিত্তিক আদিম সমাজে এই ধরনের পারস্পরিক স্বাতন্ত্রমূলক অবস্থানের অস্তিত্ব ছিল না-তা সে প্রাচীন ভারতীয়-গোষ্ঠী

সমাজের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই হোক, বা পেরুভীয় ইনকা রাষ্ট্রই হোক।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৮৭) সেইদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব না হলে বিনিময় প্রথা আসতে পারত না, সমাজ আর অগ্রসর হতে পারত না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে ভিত্তি করে প্রথম যে সমাজ এলো তা হলো দাস ব্যবস্থা। তারপর থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক এসেছে, ভিন্ন ভিন্ন শোষণের উপর ভিত্তি করে সমাজ এসেছে এবং আজ চূড়ান্তভাবে এসেছে বুর্জোয়া সমাজ বা পুঁজিবাদী সমাজ। প্রতিটি সমাজই এক শ্রেণির দ্বারা অন্য শ্রেণির উপর শোষণ, জুলুম, বঞ্চনা, অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ আসার পর, যে বাস্তবতার জন্ম হয়েছে তা হলো সমাজ আর অগ্রসর হতে পারে না, উৎপাদিকা শক্তির প্রসার বা পূর্ণ ব্যবহার হতে পারে না, যদি না সম্পদের উপর ব্যক্তি-মালিকানাকে নিঃশেষ করা যায়। সম্পদের উপর ব্যক্তি-মালিকানার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তা আজ আর অবশিষ্ট নাই। আজ ব্যক্তি-মালিকানা সমাজ প্রগতির পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা ব্যক্তি-সম্পত্তির অধিকার উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা বলি—যা হলো ভবিষ্যৎ ইতিহাসের যৌক্তিক পরিণতির দিক-নির্দেশনা। চিরকালের মতো শ্রেণি-শোষণের ভিত্তিকে উৎপাটিত করতে চাই। শোষণ-বঞ্চনা, অনাহার-দারিদ্র্য, আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য দূর করতে চাই, যার মূলে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার।

ভারতবর্ষের সম্পত্তির মালিকানার ইতিহাসটা কেমন? ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সম্পত্তির মালিক ছিল উপনিবেশিক দখলদার ব্রিটিশরা, এর আগে মোগলরা ছিল মালিক। এখানে ব্রিটিশ আমলে প্রথমে খাজনার বিনিময়ে জমির মালিক হয়েছিল যাঁরা—তাঁরা হচ্ছে জমিদার। শুরুতে ছিল পাঁচসালা মালিকানা, পরবর্তীতে দশসালা এরপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরা একদিকে যেমন ছিল ব্রিটিশদের অনুগত অন্যদিকে ছিল তাদের শাসনের খুঁটি। অর্থাৎ যতদিন খাজনা পরিশোধ করতে পারবে ততদিন মালিক থাকবে। তাহলে মালিকানার উৎস হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা, অন্যায়, শোষণ-লুণ্ঠন। এর বাইরে কোন মালিকানা নাই। আজ ব্যক্তি-সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করার অর্থ সমস্তরকম অন্যায় অবিচারকে মেনে নেওয়া। এইজন্যই বলছিলাম যে, সমাজ বিকাশের ইতিহাস যদি কেউ জানে, তা হলে সে জানে যে সম্পত্তির মালিকানা সূচনায় সমাজ বিকাশের কারণেই ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তী সময়ে অন্যায্য সুযোগ লাভ ও অন্যকে বঞ্চনা করার ইতিহাস। তাহলে আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি? পারি না। মালিকানা ব্যবস্থা হয়তো এখনই উচ্ছেদ হয়ে যাবে না কিন্তু যাঁরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইটা করবে তাদের নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে যে, বর্তমান সময়ে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি হচ্ছে অন্যায় ও শোষণ-জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সবচেয়ে বড় কথা আজকের দিনে তা সমাজ প্রগতির পরিপন্থি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে

বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বজায় রেখে সমাজ আর অগ্রসর হতে পারে না, সমাজ পরবর্তী ধাপে যেতে পারে না। এই কারণেই এই অন্যায় নির্মূল করাই হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই বিষয়ে একমত হওয়া ছাড়া বিপ্লবী হওয়া যাবে না ও বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

মূল কথা হলো জনগণের সম্পত্তি জনগণের কাছে যাবে। একদিন বিশ্বের সম্পদ বিশ্বের মানুষের হবে, বিশ্বের সকল মানুষের অখন্ড মানবিক সত্তার সমাজ হবে। সেটা হবে সাম্যবাদ। এখন বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সর্বহারাশ্রেণি তথা শোষিত জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে শোষিত জনগণের বিপ্লবী পার্টি, সম্পদ যাবে পার্টির ব্যবস্থাপনায় যৌথ পরিচালনায়। কিন্তু আমাদের দেশের বামপন্থি দলের নেতাদের সম্পদ বেড়েছে পার্টির সম্পদ বাড়েনি। নীতিগতভাবে আমাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বিপরীতমুখী। আমরা দলের সম্পদ বাড়াতে পেরেছি নীতিগত সংগ্রামের কারণে। আমাদের দলের নেতাদের সম্পদ ক্রমাগত কমতে থাকবে আর দলের সম্পদ বাড়তে থাকবে। তার প্রমাণ, আমাদের দলের যাত্রাকালে অফিস ছিল না, আমরা রিকশা গ্যারেজে বসে কাজ শুরু করি, এখন আমাদের নিজস্ব জায়গায় অফিসের পর্যায়ে এসেছি। কমরেডদের এবং জনগণের টাকায় আমরা এটা করেছি। আমরা ওই চেতনায় বিশ্বাস করি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা জনগণের সাহায্য-সহায়তায় অর্জিত যৌথ সম্পদে অনেক বড় বড় কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তা নগণ্য হলেও এটাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগায় এবং বর্তমান সংগ্রামকে জীবন্ত ও চলমান রাখছি। অনেকে নীতিগতভাবে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন কিন্তু প্রয়োগে তাঁরা আসতে পারেন নাই। আমরা বলেছি দলের একটা কাঠামো যেমন থাকবে, তেমনি দলটা গড়ে উঠবে ও পরিচালিত হবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। দলের নেতৃত্ব, দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ব্যক্তি সম্পত্তি, ব্যক্তি মালিকানা এবং তার থেকে উৎসারিত সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই করছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি-অভ্যাস, আবেগের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আদর্শিক লড়াইটাও শক্তিশালী হয়। এই সংগ্রামটা যদি না থাকে তা হলে একটা বিপ্লবী দল বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি প্রশ্ন উঠে, সবাই কি মুহূর্তে এই সম্পত্তি এবং সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দলে আসতে পারবে? ব্যাপারটা এত সরলীকরণভাবে দেখার বিষয় না। সম্পত্তি তিনি যেভাবেই পেয়ে থাকেন — সেটা উত্তরাধিকারী সূত্রে হোক, দান গ্রহণ সূত্রে হোক বা নিজের অর্জনে হোক এ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামটা নিজের জীবনে এবং দলের জীবনে জারি রাখতে হবে।

প্রথমত, স্বীকার করা যে, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারের ধারণা অন্যায় এবং দ্বিতীয়ত, এই কঠিন সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে। যাঁরা এখনও সম্পত্তি ধারণ করে দলের নেতৃত্বের জায়গায় আসবেন তাদের এই সংগ্রামটায় নামতে হবে। ব্যক্তিগত

সংগ্রামের পাশাপাশি পারিবারিক সংগ্রামও আমাদের করে যেতে হবে। আমরা জানি অসংখ্য দেহ কোষের সমন্বয়ে মানব দেহ গঠিত, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের কোষ হচ্ছে পরিবার। পরিবারগুলোর সমন্বয়ে ও যোগাযোগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। প্রত্যেকটা পরিবার হচ্ছে পুঁজিবাদের এক একটা কোষ। না হলে পুঁজিবাদ বসবাস করে কোথায়? এই পরিবারগুলোতে সম্পত্তি অর্জন করা, তা ধারণ করা, সেটাকে রক্ষা করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, হানাহানি-মারামারি ইত্যাদি করছে। পুঁজিবাদ যত দিন টিকে থাকবে এটা আরও বাড়তে থাকবে। তার বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদর্শভিত্তিক পরিবার তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনাকেন্দ্রিক পরিবার গড়ার সংগ্রাম করতে হবে। আদর্শগত সংগ্রামে রূপান্তরিত বড় পরিবারগুলো সম্পত্তিকেন্দ্রিক ভাব-মানসগত পরিবার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আদর্শভিত্তিক পরিবারে উন্নীত হওয়া একটা বিপ্লবী পার্টির বৈশিষ্ট্য।

এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আমরা ইতিহাস নির্ধারিত পথে ব্যক্তিমালিকানার সমাজ উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে একটা সভ্যতা নির্মাণ করার সংগ্রাম করছি। সেই সমাজের প্রতিফলন এই দলের মধ্যে থাকবে। সে পথে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বুর্জোয়াদের যে কোন ধরনের সক্ষমতা পরিণত হয় তাদের ব্যক্তিগত পুঁজি ও লাভ-অলাভে। যেমন, ধরুন সমাজে একজন ভালো লিখতে পারে, একজন ভালো কথা বলতে পারে, একজন ভালো গাইতে পারে, একজন মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে। এইগুলো তাঁর দক্ষতার দিক, গুণের দিক। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, নীতি-বোধ অনুসারে এইসব তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে যায়। যে যে-ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু, বিপ্লবী দলে একজন সদস্যের যা কিছু দক্ষতা-যোগ্যতা সেটা সর্বসাধারণের যৌথ সম্পদে রূপান্তরিত হয়। একটা হলো ব্যক্তিগত পুঁজি আরেকটা হল যৌথ সম্পদ। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যেকের একই রকম ক্ষমতা-দক্ষতা থাকে না, থাকবে না। এমন চিন্তা বাস্তবসম্মতও নয়। কিন্তু সবার ব্যক্তিগত দক্ষতা একটা যৌথ শক্তি-সামর্থ্য নির্মাণ করবে। কেউ দূর থেকে সমর্থন করছেন, কেউ দশটা টাকা দিয়ে সহযোগিতা করছেন, দলে তাদের প্রত্যেকের একটা ভূমিকা আছে। কেউ পাঁচটা মানুষকে দলে টানার চেষ্টা করছেন তাঁরও একটা ভূমিকা আছে। কেউ জনগণের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার বা ছাত্রদের দাবি নিয়ে দলের পক্ষে লেখালেখি করেন – তিনিও বিপ্লবের পক্ষে ভূমিকা রাখছেন। কেউ সংগঠিত মানুষদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে ভূমিকা রাখছেন। কেউ শ্রমিক-কৃষক-নারীদের মধ্যে কাজ করে ভূমিকা রাখছেন। এসব কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভ-অলাভে রূপান্তরিত হচ্ছে না, যৌথ সম্পদের শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। সমাজ ব্যক্তির কাজের স্বীকৃতি দিবে কিন্তু ব্যক্তি নিজের স্বীকৃতির জন্য লালায়িত বা কাতর হবে না। আমাদের সমাজে কেউ যদি একটু বিশেষ জায়গায় এগিয়ে যায়, তখন সে মনে করে আমি তো অন্যের চেয়ে এগিয়ে

গেলাম, আমার তো গুরুত্ব বেশি। আমি কত বেশি লোকের প্রশংসা পেলাম, জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলাম-এটাও হচ্ছে পুঁজি — ভাবের পুঁজি। এই পুঁজিতে টাকার মুনাফা নাই কিন্তু ভাবের মুনাফার মানসিকতা কাজ করে। আমরা শুরু থেকে দলের মধ্যে এ বোধ নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি যে, পার্টি একটা আদর্শভিত্তিক পরিবার। কোন আদর্শ? সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও সর্বহারার শ্রেণিচেতনার আদর্শ। সেটা কেমন? এর মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহযোগিতামূলক যৌথ সংগ্রাম। যৌথ জ্ঞানের ভাণ্ডার, যৌথ শক্তি-সামর্থ্য রচনার নিরন্তর সাংগঠনিক, রাজনৈতিক প্রয়াস। এখানে প্রত্যেকে ভূমিকা পালন করে যাবেন কিন্তু তাদের দক্ষতা-যোগ্যতাকে তাঁরা ব্যক্তিগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করবেন না। সেই মানসিকতা থেকে তাঁরা মুক্ত থাকবে।

পুঁজিপতি দুই ধরনের, একটা হলো ভাবগত পুঁজিপতি, আরেকটা হলো বস্তুগত পুঁজিপতি। ভাবের পুঁজি ও অর্থের পুঁজি দুইটার শ্রেণি চরিত্র একই। এ পর্যায়ে আমাদের নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমি ৪০-৪১ বছর ধরে দলের দায়িত্বে থাকার কারণে, নাম-ধাম পরিচিতির কারণে আমার মধ্যেও কোন কোন সময়ে অজান্তে এসব বিষয় এসে যেতেও পারে বা অতীতে আসেনি, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের দলে এখন যারা কেন্দ্রীয় দায়িত্বে এসেছেন তাঁরা পদের কথা ভাবেননি এবং এ নিয়ে কোন অবস্থান গ্রহণ করেননি বা চিন্তাও করেননি। বরং ভেবেছেন কীভাবে দলকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক, তাদেরও যৌথতার সন্ধানে নিরন্তর সচেতন সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমাদের কংগ্রেসে নতুন কমিটি হয়েছে। কমিটিতে যাঁরা আসেন নাই তাঁরাও কিন্তু ভালোই কাজ করছেন এবং জনগণের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা কে কোন পদে আছেন, কোথায় আছেন ইত্যাদি হিসাব মিলাচ্ছেন না। সর্বোচ্চ সাধ্যে কাজকে, কর্তব্যকে, দায়িত্বকে ভাবনায় রাখছেন। বিপ্লবী আন্দোলনে কাজের নীতি হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সর্বোচ্চ সাধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে কাজ করবেন। যৌথ সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য, রক্ষা করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। কিন্তু বিনিময়ে আমার প্রাপ্তি কী এটা আমি হিসাব করবো না। অন্যেরা করবে। কারণ আমি হিসাব করতে গেলে, সেটা ভাবের পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যদি আমাদের দলে এই সংগ্রাম না থাকতো তাহলে পার্টি আজকের এই জায়গায় আসতে পারতো না।

১৯৮৩ সালে আমাদের দলের অভ্যন্তরে সংশোধনবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তখন দল গঠনের প্রশ্নে বিরোধের বিষয়গুলো আপনারা সকলে জানেন। আমরা বলেছিলাম, জনগণের উপর নির্ভর করে ও তাদের সহযোগিতা নিয়ে এ দল চলবে। কারণ, যে জনগণকে নিয়ে বিপ্লব করবো, তাদেরই সহযোগিতা যদি এই জায়গায় আনতে না পারা যায়, তাহলে এই দল বিপ্লবের নেতা হতে পারবে না। জনগণ হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি। তাদের টাকা, তাদের সহযোগিতা, তাদের সমর্থন,

অংশগ্রহণ, তাদের ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রয়াসেই দল এগোবে। শুধু দলের কিছু নেতা-কর্মী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে বিপ্লব হবে না। জনগণ প্রতিটি কর্মসূচিতে যে সহযোগিতা করছে তার প্রমাণতো আমাদের কাছে আছে। মানুষ বিগত দিনে যেমন সহযোগিতা করেছে, বর্তমানেও করছে। বরং, আমরা জনগণের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা সবসময় পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারি না। শুরুতে দলের তহবিলের জন্য জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তোলাবাজ মাস্তানদের চক্রান্তে আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। যাদের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা নিয়েছি, সে দোকানদাররা আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন। সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য দোকানদারদের কাছে গেলে তাঁরা বলেছেন, এরা চাঁদাবাজি করেননি। আমরা এটাকে সংগ্রামের একটা নীতিগত দিক হিসেবে নিয়ে আমাদের নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরতে *বিপ্লবী দলের অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে* পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছি। এভাবেই জনগণ, আমাদের কর্মী-সমর্থক শুভানুধ্যায়িদের সহযোগিতা থাকবে এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয় উল্লেখ করি। আমরা কি পুঁজিবাদের আক্রমণের বাইরে থাকতে পারছি? না, পারছি না। কারণ, পুঁজিবাদ আছে মানে সে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শক্তি নিয়ে আছে। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা এবং নেতৃত্ব কি সমাজের বাইরে? যেহেতু বিপ্লবী কর্মীরা সমাজে বসবাস করেন, তাই পুঁজিবাদী সমাজের ভাবগত আক্রমণ প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপরও আসতে থাকবে। আমরা মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে তার বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখব। এটা কীভাবে হবে? এই সংগ্রামটা করতে হবে যৌথভাবে। একা একা পারা যাবে না। বুর্জোয়া আক্রমণ সব সময় আসে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আর সর্বহারা প্রতিরোধের শক্তি পায় যৌথতায়। যখন সর্বহারা একা হয়ে যায়, চিন্তায়-ক্রিয়ায়, তখন সে পুঁজিবাদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে যায়। যখন সে যৌথ সংগ্রামে দেহ-মন এক করে এটাকে মোকাবিলা করে তখন পুঁজিবাদ অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যক্তি-সম্পত্তিজাত মানসিকতা, সংস্কৃতি ও শক্তি পরাস্ত হয়ে যায়। এখনও আমাদের অনেক দুর্বলতা বের করা যাবে কিন্তু আমাদের লড়াই ছিল এবং অব্যাহত আছে। এক দল কমরেড একটা পর্যায় পর্যন্ত অতিক্রম করেছে পরবর্তীতে আর পারেনি, সেখান থেকে আরেক দল কমরেড সামনে এগিয়েছে, এই করতে করতে আমরা একটা পর্যায়ে এসেছি। যাঁরা পারলো না, কেন তাঁরা পুঁজিবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে গেলেন? কী ছিল তাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের সংগ্রামের ঘাটতি? আদর্শিক ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধনের সংগ্রাম বা প্রচেষ্টায় তাদের কী ঘাটতি ছিল? যৌথতায় কি কোন দুর্বলতা ছিল? যদি জনগণের মাঝে সংগ্রামটা ঠিক ঠিক মতো করতে পারতো তাঁরাও অগ্রসর হতে পারতো। সে দুর্বলতাটা আমাদের খুঁজে বের করা ও তা দূর করার সংগ্রাম করা দরকার। লক্ষ্য করলে একটা খুব উল্লেখযোগ্য চিত্র আপনারা দেখতে পাবেন, তা হলো এই যে বেশিরভাগ কমরেড–যাঁরা বিভিন্ন কারণে সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েছেন-তাঁরা পিছিয়ে গেলেও দল-বিরোধী, নীতি-আদর্শ বিরোধী হননি। অনেকেই ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। আপনারা দেখেছেন এবারে দলের

প্রথম কংগ্রেসে তাঁরা কত আবেগের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এটা আমাদের দলের সংগ্রামের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো দল কেন দরকার? দরকার এ কারণে যে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটা সংগঠিত শক্তি, এই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মোকাবিলা বা পরাস্ত করা যাবে না। একটা সংগঠিত শক্তিকে তার চাইতে বড় শক্তি দিয়ে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হয়। বুর্জোয়ারা সংগঠিত শক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের পক্ষে আইন-আদালত-বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, অর্থ, সমাজের ব্যক্তি-সম্পত্তির মালিকানাবোধ ইত্যাদি সব। কিন্তু মনে রাখবেন যে, তার চেয়েও বড় শক্তি হচ্ছে জনগণের ঐক্যের শক্তি। এই জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে আছে, তাদের সর্বহারা আদর্শের ভিত্তিতে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে তাঁরা বুর্জোয়া শক্তিকে সমস্ত দিক থেকে পরাস্ত করে ফেলতে পারে। জনগণের শক্তিকে বিকশিত করার বাস্তব অবস্থা বিরাজমান আছে। সামাজিক বাস্তবতা দুই ধরনের, একটা হচ্ছে অবস্থিত বাস্তবতা, আরেকটা হচ্ছে বৈপ্লবিক বাস্তবতা। সমাজের মধ্যে দুই বাস্তবতাই বিরাজ করছে এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত আছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে এই দুই বাস্তবতা দেখতে পাবেন। অবস্থিত বাস্তবতা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু আর বৈপ্লবিক বাস্তবতা দুর্বল হলেও সেটা বিকাশমান। কিন্তু আমরা যদি বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পারি, বুঝতে না পারি এবং সেই বাস্তবতা অনুযায়ী কাজ না করি, তাহলে বিদ্যমান বাস্তবতার চাপে পড়ে আমাদের যে শক্তি আছে সেটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, বুর্জোয়ারা কায়িক শ্রমিক এবং মানসিক শ্রমিককে তাদের সুবিধার জন্য আলাদা করে ফেলেছে। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার এরা হচ্ছে মানসিক শ্রমিক। যাঁরা অফিস-আদালতে অনেক বড় পদে আছেন তাঁরাও মানসিক শ্রমিক। কিন্তু ডাক্তার যদি ক্লিনিকের মালিক হয়, তাহলে সে আর শ্রমিক থাকবেন না, তিনি হয়ে যাবেন মালিক। যদি ইঞ্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় তাহলে তাকে আর মানসিক শ্রমিক বলা যাবে না। বুর্জোয়ারা মানসিক শ্রমিক আর কায়িক শ্রমিকের মধ্যে একটা দেয়াল তুলে দূরত্ব তৈরি করেছে। আমরা পেশাজীবীদের সংগঠন করছি কেন? কারণ, বুর্জোয়ারা মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তৈরি করেছে, সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে উভয়ের মধ্যে একাত্ম হওয়ার মনোভাব তৈরি করার জন্য। তাদের মধ্যে পেশাকেন্দ্রিক স্বার্থের একটা বিষয় আছে এবং তা নিয়ে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের আন্দোলন থাকবে। অন্যদিকে, আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে তাদের মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করা যে, কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবীদের শ্রমের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বস্তুগত সম্পদ এবং ভাবগত সম্পদ, উভয় সম্পদের আত্মসাৎকারী হলো বুর্জোয়ারা। এই আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে তাই একত্রে লড়াই করতে হবে।

দল, দলের নেতৃত্ব এবং যৌথতা গড়ে তোলার লড়াই কেন?

একটা কাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় এবং দলে নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো বটেই, দলের সর্বস্তরেই নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

আছে। একটা নদী পার হতে হলেও নৌকায় একজনকে হাল ধরতে হয়। হাল যদি ভেঙে যায়, তবে সব এলোমেলো হয়ে যায়, যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে, যাত্রা পণ্ড হয়। তেমনি দলের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব আছে। সংগঠনের সেই স্তরে সেটাই কেন্দ্র। কেন্দ্রটা যদি ভেঙে যায়, নিচের দিকে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। সেই জন্যই সংগঠনের সর্বস্তরেই নেতৃত্বকে রক্ষা করতে হয়, তাকে সজীব রাখতে হয়, উদ্যমী রাখতে হয়, সৃজনশীল রাখতে হয়। নেতৃত্ব না থাকলে দল হয়ে পড়ে ছন্নছাড়া, তখন সেই দল দিয়ে আর কোন কাজ হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত জনগণের চেতনার মানকে একই স্তরে তোলার জন্য বহু দিন সময় লাগে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হিসাবে আমরা জানি যে, তারজন্য বস্তুগত উপাদান তৈরি হতে হয়। এই কারণে, সাম্যবাদে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত এমন অবস্থা নিয়ে আসা কঠিন। এখানে একটা শৃঙ্খলাবোধ কাজ করতে হয়। শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য নেতৃত্বকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কমরেডদের চেতনার মান একটা স্তরে উন্নীত করার জন্য নেতৃত্বকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আবার কর্মীদেরও একটা ভূমিকা আছে। কর্মীরা যদি নেতৃত্বের সকল কাজে দায়িত্বের সাথে সহযোগিতা না করে, তাহলে নেতৃত্বের একার পক্ষে কোন কাজ সফলভাবে করা সম্ভব হবে না। এখানে উভয়ের কাজের ও সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ও জবাবদিহিতামূলক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হতে হবে। নেতৃত্ব কর্মীদের চেতনার একটা মানে তুলবে আর কর্মীরা নেতৃত্বকে রক্ষা করবে এবং এগিয়ে নেবে। যাঁরা অন্যের অযোগ্যতা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তাঁরা কালক্রমে অধিক যোগ্য হিসাবে গড়ে ওঠেন। অন্যের ঘাটতিপূরণ প্রচেষ্টা ছাড়া নিজের ঘাটতিপূরণ হয় না। অন্যকে পাল্টানোর চেষ্টা না করে নিজেকে পাল্টানো যায় না। আমরা দলের মধ্যে এই সংগ্রামটা জারি রেখেছি। কমরেডরা যদি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সহযোগিতা সংগ্রহের দায়িত্ব না নিতেন, তাহলে নেতাদের সে দায়িত্ব নিতে হতো। নেতৃত্ব হয়তো ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অনেক বেশি টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু তাতে পার্টির চরিত্র বদলে যাবে। আমরা কাজকে ছোট-বড় ভাগ করি না। প্রয়োজনের নিরিখে অংশ নেই। পুঁজিবাদী সমাজে যে কাজের দাম নেই, গুরুত্ব নেই, ছোট কাজ ভাবা হয়, বিপ্লবের প্রয়োজনে সে কাজ যাঁরা স্বেচ্ছায় করেন আমরা তাদের সম্মান দেই, মর্যাদার আসনে রাখি, হয়তো তাঁরা কোন পদে থাকেন না। নেতৃত্বের দিক থেকে এই মনোভাব থাকতে হবে যে, আমরা দল ও বিপ্লবী আন্দোলনে দিবো বেশি নিবো কম। এই মনোভাব দলের মধ্যে তৈরি করতে হবে। নেতৃত্ব দলের জন্য দায় হবে না, সম্পদ হবে। দল চেষ্টা করবে কোন কমরেড যাতে বিপন্ন না হয়ে যায়। আমাদের শ্রমিক কমরেড সরওয়ার, হানিফ এবং রঞ্জু অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। এঁরা যখন অসুস্থ ছিলেন সবসময় চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁরা দলের বোঝা না হয়ে যান। সব কমরেডরা মিলে দলের সবধরণের সম্পদ বাড়াবেন আবার ব্যক্তিগতভাবে কোন কমরেড দুর্দশায় পড়লে দল সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়াবে। আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে, দল যাতে একটা সামর্থ্যের জায়গায় যেতে পারে।

কোন কোন সময় কোন একটা বিষয়ে দলের সিদ্ধান্ত নানা কারণে ভুলও হতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে সেটা কী ব্যক্তিস্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে, না দলের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার অভাবে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক ভুল হচ্ছে। এইভাবে আমাদের বিচারটা করতে হবে। ভুল আমাদের হতে পারে, ভুল আমাদের হবে এবং যাঁরাই বিপ্লবের কাজ করেছেন তাদের সকলেরই ভুল হয়েছে। কিন্তু দেখতে হবে ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছি কী না এবং পরবর্তীকালে সেই একই ধরনের ভুল যাতে না হয়, তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি কিনা। বুর্জোয়া আক্রমণ যখন আসে তখন সর্বাগ্রে দলকে রক্ষা করতে হবে, তারপর ভুল থেকে বের হওয়ার সংগ্রাম করতে হবে।

সমাজে বৈষম্য যত বাড়বে সামাজিক ভারসাম্য তত নষ্ট হয়ে যাবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই বৈষম্য এবং সকল অন্যায়-জুলুম, শোষণ-বঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবির কারণ। কোন মানবশিশু তো জন্মগতভাবে চুরি করার মানসিকতা নিয়ে জন্মায় না, সামাজিক পরিস্থিতি তাকে চৌর্য্যবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়। মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে, সে অসহায় অবস্থাজনিত ফলাফল থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে না। ঘরে খাবার না থাকলে পুলিশ দিয়ে চোর ঠেকানো যাবে না। রাস্তার নৈরাজ্য ঘরেও ঢুকবে, কোন কিছু রেহাই পাবে না। সমাজে, রাস্তায় যখন নৈরাজ্য বিরাজ করে তখন ঘরে আমরা আনন্দে বিভোর থাকলে সেই নৈরাজ্য ঘরে ঢুকে যাবে। এটা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিষয় নয়। হয়তো সামাজিক জীবনের উপর এই মুহূর্তে আমাদের দলের নীতি-আদর্শ-জীবনবোধের যতটুকু প্রভাব, তার প্রেক্ষিতে বৃহত্তর সমাজের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিরসনে খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছি না। কিন্তু, দলের অভ্যন্তরে সেই নৈরাজ্য থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা আমরা করছি এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে। দলের অনেক কমরেডের আর্থিক সংকট আছে, দলের পক্ষ থেকে সকলের সেই সংকট মোকাবিলা করতে পারবো না। কিন্তু এই সংকটের কারণ ধরাতে পারলে সে মনোবল ফিরে পাবে এবং তা নিরসনের জন্য সমাজ পরিবর্তনের লড়াই যে একমাত্র পথ তা বুঝে ইস্পাতদৃঢ় চেতনা নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিতে পারবে। দলের কমরেডদের পারস্পরিক সহযোগিতা যত বাড়বে যৌথতা যত বাড়বে সংকট মোকাবিলা করার সক্ষমতাও তত বাড়বে।

অপরাধ, অ-নৈতিকতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তি-অহংবোধ সবই হচ্ছে সামাজিক অসঙ্গতি-সৃষ্ট বস্তুগত পরিস্থিতি পরিবেশের ফসল। যদি আমরা বস্তুগত পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে না পারি তাহলে এইগুলো দূর হবে না। এই প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস *জার্মান অধিবিদ্যা*-তে কী বলেছিলেন সেটা আমাদের উপলব্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি। *জার্মান অধিবিদ্যা* মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ কাজ। সেখানে তাঁরা বলেছিলেন 'আমাদের সেন্টের কাছে কমিউনিজম একেবারেই অনধিগম্য কারণ কমিউনিস্টরা নিঃস্বার্থপরতার বিপরীতে অহংবোধের বা অহংকারের বিপরীতে নিঃস্বার্থপরতা-কোনটারই বিরোধিতা করে না, অথবা তাঁরা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বকে তাত্ত্বিক আকারে-তা আবেগমূলক হোক বা উচ্চ মার্গের আদর্শিক আকারে হোক-প্রকাশ করে না; তারা বরং এর বস্তুগত উৎস ব্যাখ্যা করে যার পরিবর্তনের সাথে এই দ্বন্দ্ব নিজেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কমিউনিস্টরা

একদমই নীতিকথা শিক্ষা দেয় না, যেমন স্টার্নার ব্যাপকভাবে করেন। কমিউনিস্টরা মানুষের কাছে নৈতিক দাবি রাখে না; একে অপরকে ভালবাসুন, অহংকারী হবেন না ইত্যাদি; এর বিপরীতে, কমিউনিস্টরা খুব ভাল করেই জানে যে অহংবোধ যতটা, ঠিক ততটাই নিঃস্বার্থপরতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আত্ম-বিশ্বাসের (self-assertion) একটি প্রয়োজনীয় রূপ। তাই, কমিউনিস্টরা কোনভাবেই স্বার্থশূন্য মানুষ চায় না, যেমন সেন্ট ম্যাক্স বিশ্বাস করেন এবং পরে তাঁর অনুগত ডটোর গ্রাজিয়ানো যে বাণী পুনরাবৃত্তি করেন যে "সাধারণ" (general)-এর জন্য "একান্ত ব্যক্তিগত" (private individual) কে সরিয়ে দিতে হবে।' (মার্কস-এঙ্গেলস, ৫, পৃ-২৪৭)

কমিউনিস্টরা স্বার্থশূন্য নয়, তবে সেই স্বার্থ ব্যক্তিগত নয়, যৌথস্বার্থ বা শ্রেণিস্বার্থ। মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন যে, অহংবোধ হোক, স্বার্থপরতা হোক বা অন্য কোন নেতিবাচক চারিত্রিক ত্রুটি, সে সবের বস্তুগত উপাদান এই সমাজের মধ্যেই আছে। আর, বস্তুগত উপাদানের জন্যই সমাজে যেমন 'ব্যক্তি স্বার্থ' তৈরি হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে, দ্বান্দ্বিকতার সূত্র ধরেই, বৈপরীত্যের ঐক্য অনুযায়ী 'যৌথ স্বার্থ'ও আছে। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। সেই বস্তুগত পরিস্থিতি যদি না পাল্টানো যায় তবে 'ব্যক্তি স্বার্থ'-কে সমূলে দূর করা যাবে না, আর যদি পাল্টায় তবে তার সাথে 'ব্যক্তি স্বার্থ' চলে যাওয়ার বস্তুগত পরিস্থিতি তৈরি হবে।

তাহলে যতদিন না সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে ততদিন কি আমাদের দলের কমরেডরাও সেই সব হীন চারিত্রিক ত্রুটি নিয়ে চলবেন? না, নিশ্চয়ই আমরা তা নিয়ে চলবো না। সেই সব নিয়ে চললে আমরা কমিউনিস্ট বিপ্লবী হতে পারবো না। কিন্তু আমরা যে ভিন্ন বিপ্লবী সংস্কৃতি নিয়ে চলব তার বস্তুগত উপাদান কী হবে? সেই উপাদান কোথা থেকে আসবে? দলের অভ্যন্তরের যৌথতার সংগ্রাম হলো সেই বস্তুগত উপাদান। দলের নেতৃত্বে চলমান রাজনৈতিক শ্রেণিসংগ্রাম তার বস্তুগত ভিত্তি। সেজন্যই আগে বলেছি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে, লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইস্পাতদৃঢ় বিপ্লবী চরিত্র তৈরি হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কি আমরা দেখতে পাইনি হাজারে হাজারে এমন মহত্তম চরিত্র, যাঁরা অকুতোভয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিল? তাদের চরিত্রের নৈতিক আধার কোথা থেকে তৈরি হয়েছিল? কীভাবে রুমির মতো চরিত্র তৈরি হলো? লড়াই-সংগ্রামই তাদের জন্ম দিয়েছিল।

আমাদের দলও এক প্রবল সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে। এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের ইতিহাসে এই স্তরের লড়াই একমাত্র শোষণের চিরতরে অবসানের জন্য লড়াই, শ্রেণিভিত্তিক সমাজটাকেই উচ্ছেদ করার লড়াই। এই লড়াইয়ে যাঁরা শামিল হবেন, তাঁরাই উন্নত বিপ্লবী চরিত্র, অহংবোধ থেকে মুক্ত, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত, সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত চরিত্র তৈরির উপাদান পাবেন। কার্ল মার্কসও তাই বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণিকে লড়তে হবে ২০ বছর, ৩০ বছর বা ৫০ বছর ধরে এবং সেভাবেই এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সে একদিন সমাজকে পাল্টাবে এবং

লড়াই করতে করতেই সে নিজেকেও পাল্টাবে। আর এই লড়াই সব সময় যৌথ লড়াই, একক লড়াই না। একা একা লড়াই করে চরিত্র বা সংস্কৃতি অর্জন করার কথা বলা এক ভাববাদী চিন্তা। আজকের দিনে যে কোন ভাববাদী চিন্তার অর্থ হলো কোন না কোনভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি-চেতনার অনুসারী। যেমন, কোন কোন সাধকরা হিমালয়ে সাধনা করতে যান মোক্ষ লাভ করতে। তাঁরা ভাবেন একা একা মোক্ষ লাভ করা যায়। বস্তুবাদী কমিউনিস্টদের ভাবনা ঠিক তার বিপরীত। আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি চরিত্র-সংস্কৃতি অর্জন সম্ভব যৌথতায়, যৌথ আন্দোলনে অংশ নিয়ে। অনেকে মনে করেন যে, এই যৌথ-সংস্কৃতি চেতনা অর্জনের লড়াইটা শেষ পর্যন্ত বুঝি নিজের বিবেকের সাথে নিজের লড়াই বা একক লড়াই। এই ভাবনাই আসলে ভাববাদী চিন্তা, বুর্জোয়াদের চিন্তা। এই ভাবনা থেকেই তাঁরা ভাবেন যে দিনরাত নীতি-শিক্ষা দিয়ে, নীতি-শিক্ষার কথা বলেই চরিত্র সৃষ্টি করবেন। তাই যদি হতো, তাহলে পৃথিবীতে শত শত বছর ধরে ধর্মীয় গুরুরা যে নীতি শিক্ষা দিয়েছেন তাতে পৃথিবীতে কোন অসৎ লোক থাকার কথা নয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? মার্কসবাদ বা বিজ্ঞান অনুযায়ী তো কোন ঘটনাই (phenomenon) তেমন অবিকল স্থির (static) থাকতে পারে না। শিক্ষা দেয় যে, যে কোন ঘটনার (phenomenon) বা বস্তুসত্ত্বার মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী সত্ত্বা থাকে বা শক্তি থাকে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেও মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি আছে–পুঁজি এবং শ্রম। বাইরে থেকে কারো চোখে যদি নাও পড়ে, তবু প্রতিনিয়ত এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি সমাজে কাজ করছে, একের বিরুদ্ধে অপরের লড়াই চলছে। পুঁজি ক্রমাগত তার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, শোষণের হারকে বৃদ্ধি করতে চাইছে, শ্রমিককে মজুরি কম দিতে চাইছে, তাকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, তাঁর শ্রমশক্তিকে লুট করতে চাইছে; আর তার বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণি তাকে প্রতিহত করতে চাইছে। শ্রমিকের অধিকারের পক্ষে যে কোন আন্দোলনই শেষ বিচারে তাই পুঁজির স্বার্থের বিরোধী আন্দোলন। এই রকম অবস্থায় যাঁরা মনে করেন যে, তিনি কারোর পক্ষেই নেই, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আসলে তিনি পুঁজির পক্ষে আছেন। পুঁজির পক্ষে থাকলে তিনি পুঁজিবাদের সংস্কৃতিই বহন করবেন–মিথ্যা অহংবোধ, স্বার্থপরতা, নিজেকে জাহির করার প্রবণতা, পরের সম্পদ দখলের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থাকবে। আর ভালো করে বিচার করলেই দেখতে পাবেন এ সবের মূলে আছে ব্যক্তি, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির আশা, ব্যক্তির ইচ্ছা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ। আর এর বিপরীতে যদি কেউ শ্রমের পক্ষে থাকতে চান তবে তাকে সেই লড়াইয়ে থাকতে হবে—প্রত্যক্ষভাবে হোক বা অপ্রত্যক্ষভাবে হোক। লড়াইয়ে না থেকে, সংগ্রামে না থেকে শ্রমের পক্ষে কোনভাবেই থাকা যায় না। শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই হলো শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্বের আধার, লড়াই করেই তাকে টিকে থাকতে হয়, আর এই লড়াইয়ের সারবস্তু হলো যৌথতা। পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণির এই লড়াইয়ের অগ্রণী বাহিনী। এরজন্যই বলেছি কমিউনিস্ট সংস্কৃতি অর্জনের লড়াইটা একার নয়। এই সংগ্রামটা করতে হবে যৌথভাবে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের ভাবনা

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বেহাল দশা, বিশেষ করে মুক্তবাজারি দাওয়াই ব্যর্থ হওয়ার পর, এখন আবার নতুন করে কল্যাণ রাষ্ট্রের আওয়াজ তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেই জনকল্যাণ সম্ভব বলে নানা চিন্তা-ভাবনা নতুনভাবে হাজির করার চেষ্টা চলছে। রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর ইউরোপ জুড়ে শ্রমিকশ্রেণি সমাজতন্ত্রমুখী আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তখন প্রথমে কল্যাণ রাষ্ট্রের ভাবনা এসেছিল মূলত : এই আন্দোলনের মুখ ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে বুঝানো যে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার দরকার নাই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থানের সুরাহা, কাজ না পেলে বেকার ভাতা, কিছু ভর্তুকি ইত্যাদি সম্ভব। ইউরোপের কোন কোন দেশে জনকল্যাণকর এমন কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভাবে ও শক্তিশালী গণআন্দোলনের চাপে যে সমস্ত দেশে এইসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সোভিয়েত পতনের পর শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে সেগুলি ধীরে ধীরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। জনমনে আবার অসন্তোষ বাড়ছে, ইউরোপের মানুষ আবার মাঝে মাঝে রাস্তায় নামছেন। এই অবস্থায় আবারও কল্যাণমুখী অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে।

বুঝতে হবে কল্যাণমুখী অর্থনীতি সারবস্তুতে কী? প্রকৃত বিচারে জনকল্যাণ রাষ্ট্র হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে নিয়ম, সে নিয়মকে অনুসরণ করেই সরকারের রাজস্ব থেকে জনগণের জন্য অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ করা। সরকারের রাজস্ব কিন্তু শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের বা সমাজের ধনীদের কাছ থেকে আসে না। এর বৃহত্তর অংশ পরোক্ষ করের মাধ্যমে আসে সাধারণ গরিব মানুষের কাছ থেকে। যেমন, আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটেও দেখা গেছে মধ্যবিত্ত ও ধনি পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ ৩০.৯০ শতাংশ এবং পরোক্ষ কর (ভ্যাট বাবদ) সংগ্রহের পরিমান ছিল ৬৯.১০ শতাংশ অর্থাৎ সরকারের রাজস্বের ৬৯.১০ শতাংশ অর্থ জোগান দিয়েছে গরিব শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। একজন মানুষ যা কেনেন-ঋণ করে মায়ের চিকিৎসার জন্য ওষুধ কেনেন, আর পান্তাভাতের জন্য নুন কেনেন-সবখানেই আপনাকে যে কর (ভ্যাট) সরকারকে দিতে হয় তাই হলো পরোক্ষ কর। এই রাজস্ব থেকেই সরকার সাধারণত দেশের পুঁজিপতি ও ধনীদের সুবিধার জন্য যে যে দাবি ওঠে তাতেই বেশি খরচ করেন। কল্যাণ রাষ্ট্র হলো জনগণের জন্য সাধারণত ঃ যে বরাদ্দ করা হয়-সরকারি হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে-তার অতিরিক্ত কিছু অর্থ এইসব প্রকল্পে ব্যয় করা। আর পশ্চিমা বিশ্বের ধনী দেশগুলো জনকল্যাণ খাতে আমাদের মতো দেশের চেয়ে সামান্য বেশি খরচ করতে পারেন। কেন করতে পারেন? করতে পারেন কারণ তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রম সেই অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থ জোগান দেয়। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে যে মাত্রাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য তাঁরা লুণ্ঠন করে,

তারই একটা অংশ জনকল্যাণ খাতে ব্যবহার করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের ভারসাম্য সবসময় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অনুকূল। একদিকে, সামরিক শক্তির কারণে বিশ্বব্যাপী কাঁচামাল ও আকরিকের উপর অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণে পণ্য-উৎপাদনে একচেটিয়া মূল্য (monopoly price) নির্ধারণের অধিকার তাদেরকে বাণিজ্যের ভারসাম্য অন্যায্যভাবেই তাদের অনুকূলে রাখতে সুবিধা করে দেয়। এর মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উৎপাদিত সম্পদের উপর তারা ভাগ বসায়। এইসব কারণে, তাদের দেশের জনগণকে সামান্য অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে। তারই নাম 'কল্যাণমুখী' অর্থনীতি। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বে সকল দেশের পক্ষে একযোগে জনকল্যাণমুখী হয়ে ওঠা সম্ভব না, কারণ তখন কে কার সস্তাশ্রম খাটিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করবে, কে কার সম্পদের উপর ভাগ বসাবে?

তবে, এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই গালভরা কল্যাণরাষ্ট্রই বা কী করে? তারা হয়ত সাধারণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও খাদ্যের ন্যূনতম জোগান সহজলভ্য করে, কিন্তু কোনভাবেই বৈষম্যকে দূর করে না। শোষণ ব্যবস্থাকে দূর করে না। বৈষম্যের মাত্রা কমিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য নয় বা উদ্দেশ্য নয়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করি, আন্দোলনে মানুষকে জড়ো করি, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সামনে বৈষম্যের কদর্য রূপ তুলে ধরি। এইসবই সত্য। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই বৈষম্যমূলক সমাজকে পাল্টানো, বৈষম্যহীন নতুন সমাজ আনা। কারণ, কল্যাণ রাষ্ট্র হলেও যে প্রশ্নের উত্তর অধরাই থেকে যায়, তা হলো মজুরি দাসত্বের যে শৃঙ্খল তা থেকে শ্রমজীবী মানুষ কি মুক্তি পাবে? শ্রমিককে শোষণ করে বুর্জোয়াদের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করা কি বন্ধ হবে? প্রকৃতির নিয়মের সংসারে নিয়মের বাইরে তো কিছু চলে না। অর্থনীতিও তো নিয়মেই চলে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নিয়মেই আর্থিক সংকট বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে, অতি-উৎপাদনের সংকটের জন্য আর্থিক মন্দা পালাক্রমে আসে। কল্যাণ রাষ্ট্র হলে কি তার থেকে মুক্তি আসবে? ইউরোপের তথাকথিত কল্যাণরাষ্ট্রগুলোতে ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল কেন? সেই সংকটে গরিব মানুষের কী অবস্থা হয়েছিল? সেই সব দেশের শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে হয়নি, অসংখ্য মানুষ গৃহহারা হয়নি, কর্মচ্যুত হয়নি, জীবিকা হারায়নি? দেখা যায় যে, পুঁজিবাদের প্রতিটি সংকটের বোঝা শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী দরিদ্রৎ মানুষদের ঘাড়ে চাপে আর পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এবারও করোনাকালে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছে অন্যদিকে সতেরো হাজারের বেশি নতুন কোটিপতি গজিয়েছে। এমনিতেই পুঁজিবাদ ধনী-দরিদ্র বৈষম্য সৃষ্টি করে আর সংকট তীব্র হলে পুঁজিবাদ সে বৈষম্যকে অতিমাত্রায় বাড়ায়।

পুঁজিবাদ থাকলে সেটা হবেই। পুঁজিবাদের সংকট জন্মগত, ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কারণেই সংকট। পুঁজিবাদে উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজির সঞ্চয়ন (accumulation of capital) যে হারে বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র কমে আসে

বলে বিনিয়োগের হার তুলনামূলকভাবে কম হয়। উৎপাদনের হার যেভাবে বাড়ে তার তুলনায় বাজার সম্প্রসারণের হার কম হয়। অর্থাৎ, একদিকে সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ না পেয়ে অলস হয়ে পড়ে থাকে, জমতে থাকে, অন্যদিকে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত থেকে মন্দার সৃষ্টি করে। বাজারে সংকট দেখা দেয়। মুনাফার হারের পতন (falling rate of profit) ঘটতে থাকে। পুঁজিবাদী সংকটের এই অন্তর্নিহিত নিয়মগুলো কি অকার্যকর হয়ে গেছে? এই কথা কি প্রমাণ করা গেছে যে, কল্যাণরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মার্কসের দেখানো এই নিয়মগুলো আর কাজ করে না?

সম্প্রতি (২০১৩ সাল) ফরাসি অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি দীর্ঘকালীন পরিসংখ্যান (কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দীর) নিয়ে পুঁজির চরিত্র এবং দ্বন্দ্ব বুঝার চেষ্টা করেছেন-*Capital in the Twenty First Century* শিরোনামের বইতে। সেখানে প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দেখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরি জীবন-যাপনের প্রয়োজনের তুলনায় ভীষণই কম ছিল, বিশেষত পুঁজিবাদের দুই শীর্ষ দেশ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে, এমনকি কখনো কখনো তা আগের দুই শতাব্দীর থেকে কম। কিন্তু তারপরে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মজুরি বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে অনেকে বলতে চান যে মার্কসবাদ অনুযায়ী তো এটা হওয়ার কথা না। পুঁজির প্রথম খণ্ডে মার্কসের ব্যাখ্যার মধ্যে পুঁজিবাদের একটি দ্বন্দ্বের কথা আছে। তাহলো শ্রমিকের প্রকৃত-মজুরির মাত্রাকে কম-বেশি স্থির রাখার জন্য পুঁজিবাদকে শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনী রাখতে হয়। দ্বন্দ্ব এখানেই যে, যদি পুঁজির সঞ্চয়ন বৃদ্ধির হার শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হয় তবে শ্রমিকের প্রকৃত-মজুরি বৃদ্ধি ঘটে এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার কমে। যদি তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমশক্তিকে শোষণের কথা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ভারসাম্যের কথা বাদও দেই, তাহলেও পশ্চিমা বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় স্থির থাকা এবং ক্রমাগত পুঁজির সঞ্চয়নের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধিকে মার্কসবাদ দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে পিকেটি তাঁর গবেষণা থেকে যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, মার্কস যে বলেছিলেন পুঁজিবাদ নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছে তা এখনও ভয়ঙ্করভাবে সত্য। পিকেটি লিখেছেন–'শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার নিরন্তর বৃদ্ধিই পুঁজির নতুন সংস্থানের স্থায়ী সংযোজনের পরিপূরক হতে পারে, যেমনটি $\beta=s/g$ সূত্র স্পষ্ট করে। অন্যথায়, পুঁজিপতিরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা নিজেদের কবর খুঁড়বে; হয় তারা মুনাফার ক্রমহ্রাসমান হারের বিরুদ্ধে লড়াই করার মরিয়া প্রচেষ্টায় একে অপরকে ছিঁড়ে ফেলবে (উদাহরণস্বরূপ, যেমনভাবে জার্মানি এবং ফ্রান্স ১৯০৫ এবং ১৯১১ সালের মরক্কোর সংকটের সময় সেরা ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের জন্য যুদ্ধ করেছিল) অথবা তারা শ্রমকে ক্রমাগত জাতীয় আয়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করতে চাইবে, যা শেষ পর্যন্ত সর্বহারা বিপ্লব এবং সাধারণভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের দিকে নিয়ে যাবে। যে কোনো ক্ষেত্রে, পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই পুঁজিকে ধ্বংস করবে।' (পিকেটি, ২০১৪, পৃ-২৮৭)

তাহলে, বিজ্ঞানসম্মত নতুন কোন ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কসবাদকে খারিজ করা যাচ্ছে না, বিকল্প কোন রাস্তাও কেউ দেখাতে পারছে না। এটাই সারসত্য। কেইনস এর তত্ত্ব, রেগান-থেচারের মুক্ত বাজারি ফর্মুলা, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ইত্যাদি চমক সৃষ্টি করলেও শোষণ-বৈষম্যের গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করতে পারেনি। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার নিরানব্বই ভাগ বনাম এক ভাগ মানুষের আন্দোলন সেই সত্যকেই তুলে ধরেছে। রাশিয়ার বিপ্লবের আগে পরে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে দমন করার পাশাপাশি বুর্জোয়া শ্রেণি ভিতর থেকে ছুরি মারার কৌশল নেয়। একদল শ্রমিক নেতাও জুটে যায়। লেনিন যেটাকে লেবার এরিস্ট্রোক্রেসি বলেছিলেন। রুশ বিপ্লবের দুই বছরের মাথায় মার্কিন ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) গঠন করে শ্রমিকদের আইনি কিছু সুযোগ সুবিধার দলিল রচনা করা হয়। পাশাপাশি মালিক ও শ্রমিক নেতৃত্বের দরকষাকষির মাধ্যমে একসাথে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করা ও শ্রমিকেরও স্বার্থ রক্ষা করার এক তেল-জল মেশানোর মতো অবাস্তব নীতি চালু করা হয়। শ্রেণিস্বার্থের দুই মেরুতে অবস্থানকারী দুই শ্রেণির স্বার্থ একই সাথে রক্ষা করা কীভাবে সম্ভব হয়? বাস্তবে আঁটোসাঁটো বাধা থেকে মজুরি দাসত্বের লম্বা দড়িতে শ্রমিকদের বাঁধা হলো। শ্রমিক সংগঠনগুলো দালাল নেতৃত্বের হাতে পড়তে থাকলো।

মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বলেছিলেন কমিউনিজম শিক্ষার বিদ্যালয়। তার জায়গায় মালিকি ব্যবস্থা অক্ষত রেখে ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে কিছু সুবিধা আদায়ের সংস্থায় পরিণত করা হলো। কিন্তু তাই বলে কি ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করবে না, দাবি আদায়ের চেষ্টা করবে না? মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষা অনুযায়ী শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং দালাল নেতৃত্বের বদলে বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। দাবি আদায়ের আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে রূপ দিয়ে পুঁজিবাদকে লাশ ঘর থেকে কবরে নেয়ার পথে এগিয়ে যাবে। মালিক পুঁজিপতি ও দালাল শ্রমিক নেতৃত্বের মেলবন্ধনকে আরামদায়ক ও নিরাপদ করা নয়, অথবা তাদের জীবনী শক্তি বাড়াবার কাজ ট্রেড-ইউনিয়নের না। এই কথা আমরা জানি যে, পুঁজিবাদী মালিকি ব্যবস্থা এক ধাক্কায় উচ্ছেদ হবে না। সেজন্য লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে, সংগঠনকে বিকশিত করে বিপ্লবের উপযোগী দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে হবে এবং শ্রমিক ঐক্যকে সংহত করে মূল পথে অগ্রসর হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণি ঐতিহাসিকভাবে আজ বিপ্লবী নেতৃত্ব পালনের দায়িত্বের জায়গায় এসে গেছে। কিন্তু সমাজের সকল শোষিত নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি সম্ভব নয়। এদের সকলের কাছে মুক্তির বার্তা, সর্বহারা শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা নিয়ে যেতে হবে। একই সাথে বিশ্বের নিপীড়িত শ্রেণির সাথে সংহতি স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ দুনিয়ার মজদুর এক হও! স্লোগানের চেতনায় বাংলাদেশের মজদুরদের ঐক্য সংহতি গড়তে ও সম্প্রসারিত করতে মনযোগী হতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণির পার্টি বাসদ-এর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের শোষিত মানুষদের আন্দোলনকে এক কাতারে আনতে হবে। বাংলাদেশের সকল মজদুরকে ঐক্যবদ্ধ করে এক কাফেলায় শামিল করার সংকল্প বাদ দিয়ে দুনিয়ার মজদুর এক হও! স্লোগান শুধু স্লোগানই থেকে যাবে, এর আসল তাৎপর্য অনুভবে আসবে না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব শ্রেণি চেতনা আসে বাইরে থেকে। কথাটার অর্থ কী? অর্থ হলো শ্রমিকদের নিজস্ব আন্দোলনের গণ্ডি থেকে অর্থনীতিবাদী চেতনা আসে। আর যখন শ্রমিকশ্রেণি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা ও সংহতির পাশাপাশি নিজ দেশের সকল শোষিত শ্রমজীবী মানুষ শামিল হয়, অন্যায় শাসন-শোষণ-স্বৈরতান্ত্রিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে একাত্ম হয় ও শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন তা থেকেই শ্রমিকশ্রেণি তার নিজস্ব চেতনার সজীব পূর্ণাঙ্গ উপলব্দির নাগাল পায়। আমাদের সংগঠনে এই উপলব্দি অনেকটা তৈরি হয়েছে, একে আরও জীবন্ত করতে হবে। পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাথে, রি-রোলিং কারখানা শ্রমিকদের সাথে, পাদুকা শ্রমিক, চা-শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, হোটেল-পর্যটন শ্রমিক, ফসলের ন্যায্য দাম বঞ্চিত কৃষক ও ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত দিনমজুর, শিক্ষার দাবিতে সংগ্রামরত ছাত্র সমাজের, মানসিক শ্রমজীবী পেশাজীবীদের সাথে, অন্য সকলের সুখে-দুঃখে, সংগ্রামে-সংকটে সহানুভুতির সাথে থাকতে হবে। পার্টিকে কেন্দ্র করে এই সংহতি-সহানুভুতির প্রকাশ ঘটবে। এ পরিস্থিতি পরিবেশ তৈরি করা পার্টির জন্য একটা পরীক্ষা। কারণ এভাবেই শোষিত জনগণের সকল অংশকে সূতায় মালা গাথার মতো ঐক্যবদ্ধ করেই একটা বিপ্লবী পার্টি সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণির তথা শোষিত জনগণের বিপ্লবী পার্টি হিসাবে বিকশিত হয়। নেতা কর্মীরাও বিপ্লবী শিক্ষা ও সংহতির সন্ধান পায়।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা আছে মানে বিশ্বজুড়ে সাধারণ সংকট সর্বদা উপস্থিত থাকবে আর কিছুকাল পর পর বড় আকারের সংকটে দুনিয়াকে ফেলবে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ সংকটে টালমাটাল হয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা, দেশ দখল, হানাদারি ইত্যাদির পাশাপাশি দেশে দেশে অভাব, দারিদ্র, বেকারত্ব, অশান্তি, অরাজকতা বহুমাত্রায় দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ দ্বন্দ্বের পরিণতির বিশ্ব মোড়লি অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে, যেমন করে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থেকে মার্কিন কর্তৃত্ব এসেছিল। এখন রুশ-ইউক্রেন যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে বাস্তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সাথে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রচ্ছন্ন সহযোগী চীনের পরোক্ষ অবস্থানসহ যে মেরুকরণ ঘটছে তাতে মার্কিন মোড়লিপনার স্থান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশে দেশে চলতি ব্যবস্থা বা স্থিতাবস্থা বদলের সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে। যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা, অস্ত্র বাণিজ্য বিস্তার, সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল, ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের বিকাশ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির

উত্থান, সশস্ত্র সহিংসতা ইত্যাদি নানা স্থানে নানাভাবে দেখা দিতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর লেনিন মাত্র নয় মাসের মাথায় কেন বিপ্লব করতে গেলেন? নয় মাসের মধ্যেই রাশিয়ায় যখন বড় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় তখন দুটো বিকল্প সামনে থাকে। একটা হলো বুর্জোয়াশ্রেণি সংকটের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে আরও বেশি মুনাফার জন্য সম্পদের দখল নেবে। আর অন্যটা হলো শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নিজেরা মুক্তি লাভ করবে, জনগণকে মুক্ত করবে। কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রুশ শ্রমিকশ্রেণির বলশেভিক পার্টি দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছিল। মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। কেন সে ব্যবস্থা টেকেনি সে আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। মহাসংকটকালে একদিকে থাকে বাস্তব পরিস্থিতি যা বিপ্লবের অবকেজটিভ কন্ডিশন তৈরি করে। অন্যদিকে থাকে বাস্তব সাংগঠনিক প্রস্তুতি যা সাভজেকটিভ কন্ডিশন হিসাবে বিবেচিত। বাস্তব পরিস্থিতি বিপ্লবী উত্থানের জন্য পরিপুষ্ট হলেও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের সাংগঠনিক প্রস্তুতি অপ্রতুল বা দুর্বল থাকলে বিপ্লব সফল হবে না। আমাদের অগ্রাধিকার থাকবে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের অবজেকটিভ কনডিশন ও সাবজেকটিভ প্রিপারেশন ব্যাখ্যা করেছেন। স্ট্যালিন অক্টোবর বিপ্লবের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে *অন দি রোড টু অক্টোবর* গ্রন্থে দেখান যে নভেম্বর বিপ্লবের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ পটভূমিকায় কীভাবে এবং কেন রুশদেশে সর্বহারা বিপ্লব অপেক্ষাকৃত সহজে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে বুর্জোয়াশ্রেণির শাসনকে উচ্ছেদ করায় সফলতা অর্জন করে।

প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লব এমন এক সময় শুরু হয় যখন দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী : ইঙ্গো-ফরাসি ও অস্ট্রো-জার্মানদের মধ্যে প্রাণপণ লড়াই চলছিল। তা ছিল এমন এক ক্ষণ যখন নিজেদের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকার কারণে এই গোষ্ঠীর পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গভীরভাবে মনোযোগ প্রদানের সময় ও সামর্থ্য কোনটাই ছিল না। এই পরিস্থিতিটি ছিল অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে বিপুল গুরুত্ববহ, কারণ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের অভ্যন্তরে হিংস্র সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে বলশেভিকরা নিজেদের শক্তিকে জোরদার ও সংগঠিত করে বিপ্লবকে সার্থক করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে। পরিস্থিতিটি ছিল এই যে, যখন যুদ্ধের দ্বারা অবসন্ন আর শান্তির জন্যে ব্যাকুল শ্রমজীবী জনতা ঘটনাবলির নিজস্ব তাগিদেই যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসেবে সর্বহারা বিপ্লবের পথেই চালিত হয়। এ পরিস্থিতি নভেম্বর বিপ্লবের হাতে তুলে দেয় শান্তির শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ, ঘৃণ্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সাথে সোভিয়েত বিপ্লবকে সংহত করার কাজকে সহজতর করে তোলে এবং পাশ্চাত্যে শ্রমিকদের মধ্যে আর প্রাচ্যে নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে ব্যাপক সহানুভূতির জন্ম দেয়।

তৃতীয়ত, ইউরোপে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অস্তিত্ব আর দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিপ্লবের সম্ভাবনা পরিপক্ক হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে রুশদেশের বিপ্লব ছিল অপরিমেয় গুরুত্বের, কারণ তা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রুশ দেশের বাইরের সমস্ত বিপ্লবী শক্তির আশা-ভরসার স্থল বা নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে সমর্থন পেয়েছিল।

এসব বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সম্মিলনই সেই বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে যা অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় অর্জনকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে।

এখন আমাদের দেশে বুর্জোয়াশ্রেণির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতি হিসাবে আওয়ামী লীগ-বিএনপি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মানুষের সামনে যুক্তিসিদ্ধ করে শাসন পরিচালনা করতে পারছে না। তাদের শোষণ-লুণ্ঠনের চেহারা অনেক বেশি উন্মোচিত। এদের লুটপাট-দুর্নীতির চেহারা যেমন জনতার সামনে উন্মুক্ত, তেমনি দরিদ্র সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের জীবনযাপনের অবস্থার অবনতি উপলব্ধি করতে পারছে। সেই বিবেচনায় লেনিন বর্ণিত অবজেক্টিভ কন্ডিশন একভাবে আছে। কিন্তু, বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণির যে প্রস্তুতি তা এখনই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জায়গায় নাই, অর্থাৎ একভাবে দেশে বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশন বিরাজ করলেও সাবজেকটিভ প্রস্তুতি সে মাত্রায় বিরাজ করছে না।

দুঃশাসনের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষ বা শ্রমজীবী জনতার মাঝে পরিষ্কারভাবে আকাঙ্ক্ষার আকারে চলে এসেছে। তবু, এটা বলা চলে না যে, জনমানসে তা বিপ্লবী অভ্যুত্থান ভাবনার জায়গায় এসেছে। আর যে শক্তি বিপ্লব করবে, নির্দিষ্টভাবে জনতার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, আর সেই শক্তি সামর্থ্যের উপরও আস্থা তৈরি হয়নি। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির কারণে বাম বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি সমর্থন আছে, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু বিপ্লবী প্রস্তুতির বিচারে তা যথেষ্ট নয়। তাই বলে হতাশ কিংবা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা চলে না। এই সময়ে করণীয় কী তা নির্ধারণ করা, বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির স্বরূপ শ্রেণিগত দিক থেকে উন্মুক্ত করা, শ্রেণিচেতনাকে তীব্র করা, জাগিয়ে তোলা এবং শানিত করা দরকার। বুর্জোয়ারা তাদের বিভিন্ন মাধ্যমে এই শ্রেণিচেতনাকে গুলিয়ে দিচ্ছে, যেন সমস্যার মূলে শ্রেণিগত কোন ব্যাপার নাই। আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীতে শাসন-শোষণ চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার দাবিদার হিসাবে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বদল করেছে এবং এখনো বিকৃত করছে অবিরাম। মুক্তিযুদ্ধের আগেও সমাজ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যুদ্ধকালেও ছিল, এখনও আছে। বায়ান্ন বছরে শাসন ক্ষমতার অদল-বদল সত্ত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণিই ক্ষমতায় ছিল এবং আছে। এখান থেকেই জনজীবনে বঞ্চনা-দুর্দশার সূত্রপাত এবং আজকের সংকট জর্জরিত বিদ্যমান চেহারা তারই বিকশিত রূপ। ৯৫ শতাংশ শোষিত মানুষ তাদের শ্রেণিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকার সুবিধা নিয়ে বুর্জোয়া ও তাদের প্রসাদভোগী পদলেহী তাবেদার ৫ শতাংশ মানুষ আজকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। শোষকশ্রেণি

তাদের নানা রং-এর রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে এই অসচেতন অংশের সমর্থনকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে। ২৩ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ সাম্যের চেতনা, মর্যাদার ধারণা, ন্যায়-নীতি, আদর্শ-মূল্যবোধের ভাবমানস ও দেশ-জাতি-জনগণের স্বার্থে আত্মোৎসর্গের মনোভাবসহ অসাম্প্রদায়িক নিবিড় বন্ধন গড়ে তুলেছিল। পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যম গড়ে তুলেছিল-যেটা গড়ে না উঠলে মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয়ী হতে পারতাম না। এই অর্জনের সবকিছুকে লুটপাট, দুর্নীতি, কালো টাকা, পেশি শক্তি, প্রচার, আধিপত্য, ভোগবাদী স্বার্থলোলুপতা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ভোট জালিয়াতি ইত্যাদিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে এবং হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষমতা কবজায় রাখা, পরিবেশ বিধ্বংসী দখল-দূষণ সবকিছু মিলে ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে চলছে। ফলে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আজকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিনের সমাজ চিত্র কিংবা সংগ্রামী স্বাধীনতাকামী মানুষের চেহারা আজ আর দেখা যায় না। মানুষ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন, সমাজ থেকে আলগা মানুষেরা ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ভারসাম্যহীনতায় টালমাটাল। ঘরে ঘরে অশান্তি বিরাজ করছে। জনগণের ৫০ শতাংশ যে নারী, তাঁরা প্রতিনিয়ত ভীতিকর পরিবেশে বসবাস করেন। বেকারত্বের অভিশাপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার বেহাল দশায় মনে, মগজে, দেহে বন্ধ্যাত্ব আর পঙ্গুত্বসহ হাজার রকমের রোগ-বালাই বাসা বাঁধছে। এ অবস্থা ফেরাবার শক্তি কেবল বামপন্থিরা, মার্কসবাদী বিপ্লবীরাই রাখে। এ সত্য তুলে ধরতে হবে। বামপন্থি শক্তিসমূহের ভুলের, ভ্রান্তির বা বিচ্যুতির বহরও বিরাট। তবে এটাও সত্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে বামপন্থিরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে যদিও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে আসতে পারেনি। তবে এদের সীমাহীন আত্মত্যাগের ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আজকের দিনে কোন কোন বামপন্থি শক্তির বুর্জোয়া শিবিরে শামিল হওয়া দিয়ে তার বিচার হবে না। এমনকি এদেরও অতীত সংগ্রামের ইতিহাস বাতিল করা যায় না। যদিও সে ইতিহাসের উপর তারা নিজেরাই কালিমা ছড়িয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে বামপন্থাকে হেনস্তা করার হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট কখনো পুঁজিবাদের মেরামত করে জোড়াতালি দিয়ে সমাধান করা যাবে না। তবে ইতিহাসের যুক্তি অনুসারে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেনি, ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে আছে। কারণ সমাজ বিকাশের নিয়মেই পুঁজিবাদ থেকে পরবর্তী উচ্চতর সভ্যতা সমাজতন্ত্রে যাওয়া এবং সেখান থেকে একদিন সাম্যবাদ আসবেই। সভ্যতার বিকাশ একটা সিঁড়ির মতো, যেখানে সমাজতন্ত্র একটা ধাপ। রাশিয়ার মানুষই প্রথম সভ্যতার সেই উচ্চতর ধাপে উন্নীত হয়েছিল, যেখানে বেকার নাই, ভিক্ষুক নাই, কোন পতিতা নাই, শিক্ষার দ্বার ছিল অবারিত। সকলের জন্য স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ হতে পারে, কিন্তু তারা কী এটা পেরেছে? ইউরোপ কি পেরেছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি কি পেরেছে? পারেনি। সমাজতন্ত্র পেরেছিল মহৎ

আদর্শ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে। ব্যক্তিমালিকা ভিত্তিক শোষণমূলক ব্যবস্থা যদি না থাকে তা হলেই একমাত্র তা সম্ভব–যেখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনে নৈরাজ্য দূর করে শ্রমের নিরিখে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এখনও ৭০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের মুখেও টিকে আছে কিউবা। তাদের লেখাপড়া-চিকিৎসা ফ্রি। করোনার সময় তারা নিজের দেশের বাইরেও বহু দেশে মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছে। পাঁচটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে। এই রকম সক্ষমতা সমাজের ধনী-দরিদ্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমভাবে দেখাতে পেরেছে কোন পুঁজিবাদী দেশ পারে নাই। সমাজতন্ত্র দেখিয়েছিল। শুধু তা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, ইতিহাস-দর্শন, সাহিত্য, খেলাধুলা সকল ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি ছিল অভাবনীয়। অলিম্পিকে দেখা যেত প্রায় ৯০ ভাগ সোনার মেডেল পেত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েতের সাথে যুক্ত অঞ্চলগুলোও খেলাধুলায় এগিয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, গবেষণায় সৃষ্টিশীলতায় এগিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর রাশিয়ার চিঠি বইটা পড়ে নিবেন। তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু বলছেন, 'আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বরস এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে–তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে–আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল–এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে–আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ...ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। ...আপাতত রাশিয়ায় এসেছি-না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাজ করেছে তার ভালোমন্দ বিচার করার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।' তাহলে লেখাপড়ায় একটা পিছিয়ে পড়া দেশ, দরিদ্র, পশ্চাৎপদ একটা জনগোষ্ঠীকে এই জায়গায় তাঁরা নিয়ে গেলেন। পিছিয়ে পড়া দেশ অগ্রগতিতে প্রায় আমেরিকার কাছাকাছি চলে এসেছিল। এই যে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সকল শক্তিকে অতিক্রম করে গেল, সেটা সমাজতন্ত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আজকে যখন সমাজতন্ত্র নেই, তখন অন্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই বেকার-ভিক্ষুক বেড়েছে, মেয়েরা পতিতাবৃত্তিতে এসেছে, মুনাফা ও ভোগবাদী প্রবণতা ফিরে এসেছে, অপরাধ বেড়েছে।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাবার জন্য একটি অন্তর্বর্তী ধাপ। কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। সমাজতন্ত্র হলেই ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হয় না এবং শোষণের

প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায় না। ছোট ছোট মালিকানা থাকে। রাশিয়াতে ব্যক্তি মালিকানা, লিজ-সমবায়, যৌথ মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছিল। বাংলাদেশে বিপ্লব করার পরদিনই কি সব জাতীয়করণ করা যাবে? যাবে না। উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র অর্থাৎ গোটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যা পরিচালনা করে, যেগুলোকে অর্থনীতির ইঞ্জিন বলা চলে, সেই সেক্টরগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হবে। কিন্তু তার সঙ্গে যে ছোটখাট দোকান, ছোট ব্যবসা-ছোট শিল্পকারখানা ইত্যাদি সেগুলোর কী হবে? এগুলোকে কি প্রথমেই জাতীয়করণ করা যায়? রাষ্ট্রায়ত্তে আনা যাবে? যাবে না। তাহলে? সমবায়ে, যৌথ খামারে এগুলিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে তোলার পর্যায় যদি সঠিকভাবে যাচাই করা না যায়, তাহলে সেটা টিকবে না। কারণ, সমাজ পুঁজিবাদ থেকে সামন্তবাদে, সামন্তবাদ থেকে দাস যুগে যায় না। কিন্তু সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে ফিরে আসে। কেন? কারণ, সমাজতন্ত্র অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, এটা বিকশিত হয়ে সাম্যবাদে যাবে। আর বিকাশের একটা পর্যায়ে যদি হোঁচট খায় তাহলে সেটা ফিরে আসবে পুঁজিবাদে। এটা হলো সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম। সমাজতন্ত্র বিকাশের একটা জায়গায় যাওয়ার পর স্ট্যালিনকে মুছে ফেলতে যখন ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় যে যে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, সেগুলি আদতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল বুনিয়াদকেই ধ্বংস করার নীতি। ওই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের আলোচনা ও বক্তব্য অন্য জায়গায় আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র কী? এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে। শাসকশ্রেণির এত পরিবর্তন, খুনাখুনি-হানাহানি, মারামারির পরেও বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় আছে। এখন এরা দাবি করে শ্রমিকশ্রেণিসহ সব শ্রেণির মানুষ উন্নতির মধ্যে আছে। এখন নাকি কোন মানুষ খালি পায়ে হাঁটে না, ভিক্ষা করলেও জুতা সেন্ডেল পায়ে দিয়ে ভিক্ষা করে। জুতা পরে ভিক্ষা করলে কি ভিক্ষুকের অবস্থা পাল্টে যায়? মূল কথা হলো দেশে শ্রমশক্তির কারণে যে পরিমাণ সম্পদ তৈরি হচ্ছে, আয় সৃষ্টি হচ্ছে তার বণ্টনের চিত্রটা কেমন? এই সম্পদের কত অংশ শ্রমিকরা পায়, আর কত অংশ পুঁজিপতিরা দখল করছে? শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করল সেই সম্পদের মাত্র ৫-১০ ভাগ তাঁরা পাচ্ছেন, অথচ এদের ৯৫ ভাগ পাওয়ার কথা। তাহলে শ্রমিক সম্পদ সৃষ্টি করলো ১০০ ভাগ, কিন্তু পাচ্ছে ৫ ভাগ আর অবশিষ্ট ৯৫ ভাগ পুঁজিপতি আত্মসাৎ করছে। এই জিনিসটাকে গুলিয়ে দিতেই প্রচার করে মানুষ শান্তিতে আছে, সুখে আছে। মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো-সবাই জামা-জুতা পরে কোথায় ঘুরে?

আগে মানুষের জমি ছিল, খালি পায়ে জমিতে গিয়ে ফসল উৎপাদন করে সেখান থেকে গ্রাসাচ্ছদন করতো। আর এখন সে জুতা পায়ে দিয়ে ভিক্ষা করে, কামলা খাটে। সমুদ্র

পাড়ি দিয়ে বিদেশে যায় আর লাশ হয়ে দেশে ফিরে। সরকারি হিসেবে সোয়া এক কোটি মানুষ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এদের মধ্যে ১০ লাখ নারী বিদেশে গিয়ে অমর্যাদার পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়।

এখানে আর একটা শুভংকরের ফাঁকি চলছে, পার ক্যাপিটা ইনকাম (মাথা পিছু আয়) বৃদ্ধির এই ফাঁকি মানুষ বুঝে। এক জনের আয় ১ কোটি টাকা আরেক জনের ১ লাখ টাকা। এইবার এই দুইয়ের গড় করে বলা হচ্ছে মানুষের গড় আয় ৫০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এগুলো মানুষ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজের জীবনের অবস্থা বিচার করেই বুঝে, সব বিভ্রান্তিকর কথা। দেশে তো সম্পদ এমনি এমনি তৈরি হয় না, তার জন্য প্রয়োজন হয় শ্রমশক্তির। মানুষ যখন কাজ করে তারই শ্রমে উৎপাদন হয়, তাঁরাই মূল্য সৃষ্টি করে। সম্পদ সৃষ্টি করে। আমাদের মানুষকে বুঝাতে হবে যে রাত-দিন কাগজে-টিভিতে ফলাও করে যে জিডিপির কথা বলা হয়, সেই জিডিপি আসে কোথা থেকে? সেই জিডিপি তৈরি হয় শ্রমিক-কৃষকের শ্রমে, যা জাতীয় আয়। কলকারখানার উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদনের মধ্য দিয়েই সম্পদ-মূল্য তৈরি হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনে ভূমিকা রাখে কারা? উৎপাদন করে দিনমজুর-খেতমজুর, গরিব-মাঝারি চাষি, কারখানার শ্রমিক, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। দেশের মোট উৎপাদনে এদের শ্রমশক্তির অংশ কতটা? এই হিসাবটা তাঁরা মানুষকে দেয় না। সাধারণভাবে মানুষকে দেখাতে হবে যে, সম্পদ সৃষ্টি করছে কারা, আর আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে কারা, সম্পদের মালিক হচ্ছে কারা।

বুর্জোয়া সে বুর্জোয়া ব্যবস্থার শোষণ করার বিধি মেনেই বুর্জোয়া হোক, আর লুট-পাট করে বুর্জোয়া হোক- সাধারণ মানুষ বা শ্রমিকের স্বার্থের প্রেক্ষিতে একই কথা। যেভাবেই হোক না কেন এরা বুর্জোয়া। বুর্জোয়ারা আইনের প্রাচীর তৈরি করে তাদের সম্পত্তির মালিকানা রক্ষা করছে। মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়, যেহেতু তিনি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই তিনি মালিক, ফলে মুনাফা পাওয়া তার বৈধ অধিকার। কিন্তু এই মুনাফা হয় কীভাবে? শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে। অর্থাৎ শ্রমিক যদি ১০০০ টাকার শ্রমশক্তি দেয়, তবে তাকে মজুরি হিসাবে দেয়া হয় ৫০০ টাকা। মজুরি বাদ দিয়ে মালিক যে টাকাটা পায়, তাই উদ্বৃত্ত মূল্য। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমশক্তি সে উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে। এটাই শোষণ এবং এখানেই শ্রমিকের বঞ্চনার শুরু। এটা দৃশ্যত মনে হয় আইন মেনেই হচ্ছে, ন্যায়সঙ্গতভাবেই হচ্ছে এবং মালিক তাঁর প্রাপ্য পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে না। মার্কস এটাই দেখিয়েছেন বা আবিষ্কার করেছেন। উৎপাদনে কাঁচা-মাল বা যন্ত্রপাতির যেটুকু ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে, তা বাদ দিলে উৎপাদিত সম্পদে যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হয় তাতে পুঁজির কোন ভূমিকা নেই। অর্থাৎ, মালিকের কোন ভূমিকা নেই বা অবদান নেই বা সে কিছু সংযোজন করে না। সম্পদে সমস্ত অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হয় শ্রমশক্তি থেকে। অর্থাৎ একমাত্র শ্রমিকই তাঁর শ্রম দিয়ে এই মূল্য সৃষ্টি করে। আর যে পুঁজির কথা তাঁরা বলে, সেই পুঁজিও আসলে পূর্বের কোন

উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের ফসল। এই কারণে মার্কস পুঁজিকে বলেছেন ঘনীভূত মৃত শ্রম।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই শোষণকেই বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি তৈরি হয়েছে। এইভাবে তাঁরা শোষণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তো আত্মসাৎ করছেই, এর বাইরে গিয়েও চুরি করছে, কর ফাঁকি দিচ্ছে, নদী-জমি-জঙ্গল-বন দখল করে সম্পদ তৈরি করছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শোষণকে বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য যে নিয়ম-কানুন বুর্জোয়ারাই তৈরি করেছে, মুনাফা করতে গিয়ে সেইগুলিকেই তাঁরা মানে না। মালিক দুইটা খাতা রাখে-একটা হলো তার নিজের খাতা, আরেকটা হলো সরকারকে দেখানোর জন্য। সে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা করলে কাগজ-পত্রে দেখায় ৫০ কোটি টাকা। এ জন্যই এদেরকে লুটেরা বলা হচ্ছে। কতভাবে যে তাঁরা মানুষের অর্থ, সম্পদ লুট করছে তার হিসাব নাই। একটা ঠিকাদারির কাজ করবে, হিসাবে ধরা হয়েছে ২০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই ২০ কোটি টাকার মধ্যে তাঁর মুনাফার অংশ ধরা আছে। তা সত্ত্বেও খরচ করলো ১০ কোটি টাকা – সিমেন্টের জায়গায় বালি, স্টিলের রডের জায়গায় বাঁশ দিয়ে কাজ সেরে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করলো। এরা এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের নামে ওভার ইনভয়েজ, আন্ডার ইনভয়েজের ভুয়া বাণিজ্য করে। কর ফাঁকিসহ নানান ধরণের অবৈধ উপার্জনের সাথে এরা যুক্ত। পুঁজিপতিরা এই অবৈধ লুটপাট আর বৈধ-লুটপাট, দুইটা মিলেই লুটেরা। এখন পুঁজিবাদের বৈধ নিয়ম-নীতি মেনে কোন পুঁজিপতি কাজ করে না। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্য এক কথায় লুটেরা বলা হচ্ছে। তার মানে এই নয়, যারা বিধি-নিয়ম মানে তারা সাধু পথে চলে। এই সবটা মিলেই হচ্ছে লুটেরা।

আজকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসক বুর্জোয়া দলগুলোর চরিত্র অনেক বেশি উন্মোচিত হয়েছে। খালি চোখেও মানুষ সেটা দেখে। শাসকরা গণতন্ত্রের কথা, ভোটের কথা বলে কিন্তু গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না, মানুষ ভোট দিতে পারে না, সেটা উন্মোচিত হয়ে গেছে। দিনের ভোট রাতে করে, আবার বিনাভোটে নির্বাচিত হয়। পুঁজিবাদ ভোগবাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে আর্থিক সুবিধা এবং শোষণ-লুটপাটের ক্ষেত্র ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন একদল উপরের দিকে কলমের খোঁচায় লক্ষ-কোটি টাকা লুট করে আর নিচের দিকের লোকেরা কলম দিয়ে পারে না-ছুরি-চাকু, বল্লম নিয়ে তাদের নামতে হয়। নির্বাচনে গিয়ে খুনখারাবি করতে হয়, এমপি নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি, পেশি-শক্তির আস্ফালন চলে। ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতার জন্য মারমুখী লড়াইতে লিপ্ত হতে হয়। দেশে যে বেকার জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, শাসকরা এদের শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে গিয়ে লাঠিয়াল বা তাদের একটা পেটোয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্য হিসাবে গড়ে তোলে। তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার শক্তি হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণি উপর দিকে গড়ে তোলে তাদের বাহিনী। আর নিচের দিকে যাঁরা লুটপাটের অংশীদার হতে চায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, খুনাখুনির পরিবেশ তৈরি করে। এই হচ্ছে বুর্জোয়া রাজনীতি।

আমরা সমাজতন্ত্র চাই কেন? সমাজতন্ত্র কোনো অলৌকিক জ্ঞান নয় বা হঠাৎ করে আবিষ্কার করা কোন ব্যবস্থা নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে ইতিহাসের সৃষ্টি। সর্বহারাশ্রেণি এবং পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামেরই পরিণাম। এটা হলো সমাজ বিকাশের একটা উচ্চতর ধাপ। পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদী সমাজে যাওয়ার প্রথম পর্যায়। উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার প্রথম ধাপ হলো সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদ অন্যায়-জবরদস্তির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে প্রতিষ্ঠা করে, উৎপাদনের উপায়ের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের ওপর শোষণ চালায়, অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি করে, বেকারত্ব তৈরি করে। তার অবসানের জন্যই ঐতিহাসিক যৌক্তিকতায় যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কথা বলে, তাই সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রই নিশ্চিত করতে পারে উৎপাদিকা শক্তির পরিকল্পিত বিকাশ এবং জন্ম দেয় উৎপাদন সম্পর্কের নতুন রূপ। সমাজতন্ত্রে সবাইকে কাজ করতে হবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, আর রাষ্ট্র তার কাজ অনুযায়ী তাকে দেবে (From each according to his ability, to each according to his work)। যখন সমাজ সাম্যবাদে পৌঁছাবে তখনই একমাত্র মানুষ তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু পাবে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী (From each according to his ability, to each according to his needs)। ধীরে ধীরে কলকারখানা, জমি, ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান সবই প্রথমে রাষ্ট্রের তথা কালক্রমে সমাজের সম্পত্তি হয়ে যাবে। এটা কি শুধু আমাদের মনগড়া চাওয়া? না। এটা সমাজ বিকাশের নিয়মেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এই তত্ত্ব-কথাগুলো মানুষ সহজে বুঝতে পারে না-তাদের সামনে সহজ-সরলভাবে কথাগুলো নিয়ে আসতে হবে। যেমন, একটা উদাহরণ দেই। আমরা কয়েক দিন আগে সোনারগাঁয় গিয়েছিলাম। সেখানে একজন চায়ের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম-'কেমন আছেন? কীভাবে দিনকাল যাচ্ছে?' দোকানদার বললেন-'ভাই, কেমন আছি শুনেন। আগে আয় করতাম পাঁচ টাকা, খরচ করতাম তিন টাকা, দুই টাকা হাতে থাকতো। এখন আয় করি দশ টাকা খরচ করি ১২ টাকা, দুই টাকা দেনা হয়।' আমিতো তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। এত সহজভাবে এই অর্থনীতির হিসাবটা তো আমি বলতে পারতাম না। মানুষ কার্যকারণ না বুঝলেও, সূত্র না বুঝলেও এসব সমস্যা কিন্তু ঠিকই বুঝে।

আমাদের কাজ হলো সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষকদের সামনে শাসকশ্রেণির চরিত্র উন্মোচন করা। এর বিরুদ্ধে কোন্ শক্তি লড়াই করছে, তাকে মানুষের সামনে উপস্থিত করা। কোন বিষয়গুলোর কী যুক্তি বুর্জোয়ারা দিচ্ছে তার জবাবগুলি মানুষের কাছে হাজির করা। তাদের আন্দোলনের মাঠে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা চালানো।

তখন মানুষ দেখবে তাদের পক্ষে কোন শক্তি কথা বলে, এরা সংখ্যায় কত, তাদের শক্তি কেমন? কম হোক বেশি হোক এরা ধারাবাহিক ও আন্তরিক কিনা? বিপদে এরা পালাবে কিনা? এগুলো দেখতে দেখতে একটা সময় মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হবে। সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে শোষিতশ্রেণির মানুষ রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সংগ্রাম করতে করতে তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা কেমন আছে তা বুঝতে পারে।

এর মধ্যদিয়ে সে বোধের দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মানসিক শক্তি বাড়ে, তাদের উদ্দীপনা ও ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। আবার আন্দোলনের শক্তিকে ভাঙতে দেখলে এদের মধ্যে অনাস্থা তৈরি হয়। শ্রমজীবী মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ও তাদের সমস্যাগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, সমাধানের যুক্তিগুলো তুলে ধরতে হবে, তাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। লড়াইটা কীভাবে করতে হবে তা দেখাতে হবে। সব লড়াইয়ে আমরা হয়তো জিতব না, কিন্তু লড়াইটা অব্যাহত রাখতে হবে। মাও সে-তুং যেমন বলেছেন, সর্বহারাশ্রেণি ক্ষমতায় যাবার আগ পর্যন্ত বারে বারে পরাজিত হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে। আমরা কখনও জিতব কখনও হারবো। এই হারা জিতার মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণির চূড়ান্ত বিজয় আসবে।

ভারত-নেপালসহ এশিয়ার দেশগুলো, ইউরোপের দেশগুলো, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। কিন্তু সব জায়গায় ধ্বনিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রের কথা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বার্নি সেন্ডার্সকে বলতে হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের কথা। তিনি যখন সমাজতন্ত্রের স্লোগান সামনে নিয়ে এলেন, ইয়াং জেনারেশন রাস্তায় নেমে গেল। আগে আমেরিকার কোন নির্বাচনে যুবসমাজ এভাবে নামে নাই। বার্নিকে যখন প্রার্থীতা থেকে সরিয়ে দিল, তখন ইয়ংরা আর রাস্তায় নাই। তারমানে এই নব প্রজন্মের কাছে এটাকে আড়াল করতে পারছে না। আমেরিকা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে। তারা প্রচার করছে, সমাজতন্ত্র একটা পাপ-মহাঅন্যায়, এটা স্কুল-কলেজে ছাত্রদের পড়ানো হয়। তারা প্রচার করে, গণতন্ত্রের প্রতীক আব্রাহাম লিংকন আর একনায়কতন্ত্রের প্রতীক হিটলার ও স্ট্যালিন। হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনী গঠন করেছে, আর কমরেড স্ট্যালিন সেই ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাস্ত করতে সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাহলে তাদের কাছে স্ট্যালিন কেন ডিক্টেটর? উত্তরে তারা বলে যে, স্ট্যালিনের গুরু কার্ল মার্কস তো বলেছেন 'ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেতারিয়েত'। মার্কসের এই বক্তব্য ১৮৪৮ সাল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যত রকমে সম্ভব বিকৃত করেও শান্ত হয়নি।

সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব কী? সর্বহারা বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রকে সুরক্ষা দিতে ৯৫ ভাগ মানুষের স্বার্থে ৫ ভাগ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুরক্ষার স্বার্থে ৫ ভাগ লোকের স্বার্থের পক্ষে ৯৫ ভাগ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ। ফলে সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব হচ্ছে সেই ক্ষমতা, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের নির্মাণকাজ সম্পাদন করে। সমাজতন্ত্রের বিজয় ধরে রাখতে হলে, বুর্জোয়াশ্রেণির শাসন ব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলো উচ্ছেদ করতে হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে, এটা করতে হবে সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বে। মার্কস বলেছেন, 'পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে আরেকটিতে বিপ্লবী উত্তরণের এক কাল। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক উত্তরণকাল রয়েছে, যে সময়কালে সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া রাষ্ট্র আর অন্য কিছু হতে পারে না।' (মার্কস, ১৮৭৫, পৃ-৯৫)

লেনিনও এ সম্পর্কে বলেছেন-'একনায়কত্বের উদ্দেশ্য হলো সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, শ্রেণিতে শ্রেণিতে সমাজের বিভক্তির অবসান ঘটানো, সমাজের সকল সদস্যকে কাজের সাথে যুক্ত করা, মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণের ভিত্তি উপড়ে ফেলা। এই উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে একটি বেশ দীর্ঘ উত্তরণকাল, কারণ উৎপাদনের পুনর্গঠন হচ্ছে একটি কঠিন ব্যাপার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল আমূল পরিবর্তনের জন্যে সময় দরকার। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া অভ্যাসের বিপুল শক্তিকে কেবলমাত্র একটি দীর্ঘ, অধ্যবসায়পূর্ণ সংগ্রাম দ্বারাই পরাস্ত করা যায়। সেই কারণেই মার্কস সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের গোটা কালকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকাল বলে বর্ণনা করেছেন।' (লেনিন, ১৯১৯, পৃ-৩৮৮)

বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র কী? মার্কস কমিউনার্ডদের উদ্দেশ্যে কীভাবে কার্যকরী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* বইতে লেনিন বলেছিলেন যে, 'শাসকশ্রেণির কোন কোন অংশ সংসদের মাধ্যমে জনগণকে দমন ও পেষণ করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা স্থির করা-এই হলো বুর্জোয়া পার্লামেন্ট প্রথার আসল মর্মার্থ এবং সেটা শুধু পার্লামেন্টারি-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও' (লেনিন, ১৯১৭, পৃ-৪২৭) । এই কারণে, আমরা বলি গণতন্ত্র দুই ধরনের। একটা হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র, অন্যটা হলো সর্বহারা গণতন্ত্র।

পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করছে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নাই, পুঁজিবাদে গণতন্ত্র আছে। এটা একটা মিথ্যা প্রচার। কথাটা এরা উল্টা করে বলে। পুঁজিবাদীদের গণতন্ত্র কী? লেনিন দেখিয়েছিলেন, 'শোষকেরা রাষ্ট্রকে অনিবার্যরূপেই শোষিতদের উপর তাদের শ্রেণির তথা শোষকদের শাসনের এক যন্ত্রে রূপান্তরিত করে। তাই সংখ্যাধিক্যের তথা শোষিতদের উপর শাসন পরিচালনাকারী শোষকেরা যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও অনিবার্যরূপে অবশ্যই হবে শোষকদের গণতন্ত্র। এরূপ রাষ্ট্র থেকে শোষিতদের রাষ্ট্র অবশ্যই মৌলিকভাবে হবে ভিন্ন; সেটা অবশ্যই হবে শোষিতদের গণতন্ত্র।' (লেনিন, ১৯১৮, পৃ-২৫০)

বুর্জোয়ারা কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নানা মিথ্যা অপপ্রচার শুরু করেছিল। এই কারণে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের প্রথম লাইনেই লেখা হয়েছে, ইউরোপ ভূত দেখছে কমিউনিজমের ভূত। এমন কোন শক্তি নাই যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। বাস্তবে কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের আগে থেকেই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়েছে, বিরামহীনভাবে তা চলছে এখন পর্যন্ত। এক দিনের জন্যও তারা এই মিথ্যাচার থেকে সরেনি।

পুঁজিবাদ কী করছে? পুঁজিবাদ শ্রমিককে মেশিন বানিয়েছে। দেশের সম্পদ অবৈধভাবে অর্জন করে বিদেশে পাচার করছে। মানব ইতিহাসের সম্মানিত পেশা-বৃত্তির মহত্বই বুর্জোয়াশ্রেণি ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী

সবাইকে তারা পরিণত করেছে নিজেদের বেতনভুক্ত মজুরি শ্রমিকে। পরিবার প্রথার মধ্য থেকে তার আবেগপূর্ণ ঘোমটাকে ফেলে দিয়েছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক টাকা-কড়ির সম্পর্কে।

দেশের রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি

আমাদের দেশে ১৯৭৫ সালে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই সময় বিপ্লবের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা শ্রমিকশ্রেণি কাজে লাগাতে পারেনি, কারণ শ্রমিকশ্রেণির কোন প্রস্তুতিই ছিল না। জাসদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছিল। মুজিব পরিবার খুন হওয়া, ক্ষমতা দখল পাল্টা দখলের প্রক্রিয়ায় টালমাটাল পরিস্থিতি চললো কিছুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসল সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে। সেদিন লড়াই ছিল শ্রমিকশ্রেণি বনাম বুর্জোয়াশ্রেণি। বামপন্থি রাজনীতির দুর্বলতার সুযোগে শাসকশ্রেণি আজকে জনগণের সামনে রাজনীতি মানেই মূল বিরোধ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে বুর্জোয়া বনাম বুর্জোয়ারদের নীতিহীন লড়াই।

আওয়ামী ও বিএনপি এই দ্বিদলীয় ধারা দাঁড়িয়ে গেল। শাসক বুর্জোয়া বনাম শোষিত সর্বহারাশ্রেণির দ্বন্দ্বটা বাহ্যিকভাবে চাপা পড়ে গেল। এরপর বুর্জোয়া শাসনে ৮০ সালে আবার সংকট দেখা দিল। এই সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম। ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর বাসদের প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৮১ সালের নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ওই নির্বাচনে জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানি স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। আমরা তাঁকে নাগরিক কমিটির ব্যানারে সমর্থন দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলাম।

ওই নির্বাচনে আব্দুস সাত্তার ছিলেন বিএনপির প্রার্থী; ড. কামাল হোসেন ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী; জাসদের প্রার্থী ছিলেন মেজর (অবঃ) এম. এ. জলিল; অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ ছিলেন ন্যাপ ও সিপিবির প্রার্থী। সে সময় যে একটা নাগরিক কমিটি হয়েছিল, এই নাগরিক কমিটির মধ্যে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ড. আহমেদ শরীফ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. মনিরুজ্জামান মিঞা, ডা. কাজী কামরুজ্জামান, সাদেক খান, এনায়েত উল্লাহ খানসহ অনেকেই ছিলেন। আর রাজনৈতিক দল হিসেবে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আমাদের দল বাসদ, আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যাওয়া মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে মিজান আওয়ামী লীগ ও জেনারেল ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টি ছিল। এই নাগরিক কমিটিকে অন্যান্য বামপন্থি দলগুলি সমর্থন দেয়নি। নির্বাচনী কার্যক্রমে আমাদের দলের নাম প্রচার হয়েছিল, আমাদের বক্তব্য জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। দেশে সামরিক শাসনের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে, এই বক্তব্যের যুক্তি মানুষ গ্রহণ করেছিল। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীরাও বিষয়গুলিকে সামনে এনেছিলেন। কিন্তু নাগরিক কমিটির সাথে বামপন্থি শক্তিগুলো এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা যুক্ত হয়ে যদি নির্বাচন করত, তাহলে এরশাদের মার্শাল ল' হয়তো এতো সহজে আসতে পারত না।

এরপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির পর স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের সময় ঐক্য গড়ে উঠেছিল। তখন আন্দোলনের শক্তি হিসেবে প্রথমে ১৫ দল ও ৭ দল ছিল। পরে ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ১৫ দল থেকে প্রথমে বাসদ একা বেরিয়ে আসে এবং পরে আরও ৪টি দল বেরিয়ে আসলে বাসদসহ ৫টি বামপন্থি দল একত্রে ৫ দলীয় জোট গড়ে তোলে। পরবর্তীতে ৮ দল, ৫ দল ও ৭ দল এই তিন জোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুগপথ আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের শক্তি হিসেবে ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ, সম্মিলিত নারী সমাজ, প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-চিকিৎসক ফোরাম (প্রকৃচি), সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ ইত্যাদি আন্দোলনের সংস্থা। তখন যতগুলি আন্দোলনকারী শক্তি ছিল, সবাই সংগ্রাম কমিটিতে যুক্ত হয়েছে। এই সংগ্রাম কমিটি অনেকটা সোভিয়েতের আদলে গঠিত হয়েছিল। এগুলি যখন গড়ে উঠেছিল, মানুষ যখন আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হচ্ছে তখনই বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি, আওয়ামী লীগ '৮৬ সালে সামরিক শাসনের অধীনে পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যাই হোক এরপর '৯০-এ গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। আমরা তখন দাবি করেছিলাম, গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী আন্দোলনকারী শক্তিসমূহের দাবি পূরণের জন্য তিন জোটের অর্থাৎ আন্দোলনকারী শক্তির সরকার করতে হবে এবং দাবি পূরণের সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। আমাদের বক্তব্য তাঁরা গ্রহণ করে নাই। পরবর্তী সময়ে ভিন্ন দাবির ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলো, এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপির রাজনীতির স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা হলো। যারা আন্দোলনকারী শক্তি ছিল, সে শক্তিকে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি–এই দুই ভাগে ভাগ করে দেয়া হলো। এটা আরেকটা বিপর্যয়।

১৯৮০ সালে বাসদ প্রতিষ্ঠার পর '৮১-র নির্বাচনে আমরা কিছু মাত্রায় জনগণের সামনে আমাদের দলকে পরিচিত করতে পেরেছিলাম। ঠিক তার পরপরই ১৯৮৩ সালে একদল নেতা-কর্মী দল ত্যাগ করলো। তারপরে যখন আমরা দ্বিতীয় সংকট মোকাবিলা করছি, তখন আবার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কিছু লোক দল ছাড়লো। এভাবে একের পর এক সংকট আসলেও আমরা সেইগুলোকে মোকাবিলা করেই বর্তমান পর্যায়ে এসেছি।

২০০৭-০৮ এর তৃতীয় বুর্জোয়া সংকটের পর ২০১৪ সাল থেকে এখন চলছে চতুর্থ সংকট। এই সংকটকালে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর কিংবা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশ একটা সংকটের দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী হবে? আমরা আগে যে দাবি তুলেছিলাম, লেফট এন্ড লিবারেল তা এখনও কার্যকর আছে বলে আমরা মনে করি। বামপন্থি শক্তিকে কেন্দ্র করে উদারপন্থি শক্তি-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক-ছাত্র, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী এদেরকে একত্রিত করতে হবে। কারণ, তারা যেহেতু মনে করে না, আওয়ামী লীগ

অথবা বিএনপির শাসনে জনগণের অধিকার বা দাবি পূরণ হবে। তাই এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সাথে নিতে হবে। জনগণ এখনও এটা বিশ্বাস করে না যে বামপন্থি কোন শক্তি এককভাবে একটা বিকল্প দাঁড় করাতে পারবে। ফলে, এই বাম ও উল্লিখিত উদার গণতান্ত্রিক শক্তিটাকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে নামতে হবে। এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে একটা দলের উদ্যোগ লাগবে। সেই দলকে লিডিং রোল প্লে করতে হবে যাতে অপরাপর শক্তি তার সমর্থনে এসে দাঁড়ায়। এইবার যে সুযোগটা আমাদের কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে-মানুষ দেখছে যে, বামপন্থিদের মধ্যে আমাদের বক্তব্যটা গণমুখী এবং শাসকশ্রেণির চরিত্র উন্মোচনকারী, দলে শৃঙ্খলা আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শক্তি কম। এখন আমাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি এবং অন্যদের ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতিহাসে এমন সময় আসে, যখন এক বছরে দশ বছরের অগ্রগতি হয়, আবার এমন সময় আসে যখন ১০ বছরেও এক বছরের শক্তি অর্জন করা যায় না।

আপনাদের জানিয়ে রাখি যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে একটা সংঘাতময় পরিবেশ তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। হয় একটা গৃহযুদ্ধের দিকে যাবে অথবা আবার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটবে অথবা বুর্জোয়া দলগুলো বিদেশি শক্তির চাপে ভরসায় নিজেদের মধ্যে আসন বিলিবণ্টনের মাধ্যমে 'গণতন্ত্র', 'গণতন্ত্র' খেলা খেলবে। শাসক শ্রেণি চাইবে জনগণের চোখে বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাকে আবারও মানানসই করে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, কারণ সাধারণ মানুষ যে বর্তমান ব্যবস্থার উপর ভরসা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে সেটা তাঁরাও বুঝতে পারে। আমরা এর কোনটাতেই ঢুকতে পারবো না। তাই এই সময় জনসাধারণের সামনে, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে আমাদের দৃশ্যমান থাকতে হবে। এর জন্য দরকার আমাদের কমরেডদের মধ্যে সমগ্র বিষয়গুলিকে নিয়ে চিন্তার ঐক্য-সাধন করা। সাংগঠনিকভাবে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করা। এটা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলে হবে না। প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে। কংগ্রেসের প্রস্তুতি পর্বে আপনারা সেটা করেছেন। তা না হলে কংগ্রেসে এ সফলতা আসতো না। সারাদেশে আমাদের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী, কর্মী-সংগঠক যে যেখানে আছেন প্রত্যেকে তাদের নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে চেষ্টা করেছেন। সময়ের ডাক হলো তাকে আরও জোরদার করতে হবে। এভাবে দলকে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছে নেওয়া যাবে, বিস্তৃত করা যাবে, সুসংহত করা যাবে। কালক্রমে গৌণ থেকে মুখ্য ভূমিকায় আসতে হবে, দর্শকের বদলে নির্ধারকের ভূমিকায় যেতে হবে। এটাই সময়ের দাবি।

জয় সমাজতন্ত্র, জয় সর্বহারা জনতার জয়!

সূত্র নির্দেশিকা:

আইজাক নিউটন ((১৭২৯), 'ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপলস অব ন্যাচারেল ফিলসফি অ্যান্ড হিস সিস্টেম অব দ্য ওয়ার্ল্ড', ভ-২, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোরনিয়া প্রেস, বার্কলে

এফ. এঙ্গেলস (১৮৮০), 'সোশ্যালিজম: ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক', রচনাবলি, খণ্ড-২৪

এফ. এঙ্গেলস (১৮৮৬), 'লুডউইগ ফুয়েরবাখ এবং ক্লাসিক্যাল জার্মান দর্শনের অবসান', রচনাবলি, খণ্ড-২৬

এফ. এঙ্গেলস (১৮৮৭), 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', রচনাবলি, খণ্ড-২৫

এফ. এঙ্গেলস (১৯২৫), 'ডায়ালেকটিকস অব নেচার', রচনাবলি, খণ্ড-২৫

কার্ল মার্কস (১৮৫০), 'ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব', রচনাবলি, খণ্ড-১০

কার্ল মার্কস (১৮৫৩), 'দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া', রচনাবলি, খণ্ড-১২

কার্ল মার্কস (১৮৭৫), 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা', রচনাবলি, খণ্ড-২৪

কার্ল মার্কস (১৮৮৭), দাস ক্যাপিটাল, (প্রথম ইংরেজি সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো

কার্ল মার্কস- ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৯৩২), 'জার্মান আইডিওলজি', রচনাবলি, খন্ড-৫

কে. ওয়েস্টারগার্ড (১৯৮৫), 'স্টেট অ্যান্ড রুরাল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ: আ স্টাডি ইন রিলেশনশিপ' উদ্ধৃতি রবার্ট ডি স্টিভান্স, 'ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট অ্যান্ড রুরাল চেইঞ্জ', ভল্যুম-৩৬, নং-১

জন লিউস (১৯৩৭), 'আ টেক্সট বুক অব মার্কসিস্ট ফিলসফি', লেনিনগ্রাড ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি, ভিক্টর গোলাঞ্জ লি., লন্ডন

জে. এল. ই. ড্রেয়ার (১৯০৬), 'হিস্ট্রি অব প্লানেটারি সিস্টেম: ফ্রম থ্যালেস টু কেপলার', কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস

ডেভিড বম (১৯৫৭), 'ক্যজালিটি অ্যান্ড চান্স ইন মডার্ন ফিজিক্স', রুটলেজ, লন্ডন

থমাস পিকেটি (২০১৪), 'ক্যাপিটাল ইন দ্য টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি', দ্য বেল্কন্যাপ প্রেস অব হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৬০), 'ভারতীয় দর্শন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

ভি. আই. লেনিন (১৯০৯), 'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম', রচনাবলি, খণ্ড-১৪

ভি. আই. লেনিন (১৯১৩), 'মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ', রচনাবলি, খণ্ড-১৯

ভি. আই. লেনিন (১৯১৬ক), 'ইমপিরিয়ালিজম: দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম', রচনাবলি, খণ্ড-২২

ভি. আই. লেনিন (১৯১৬খ), 'জুনিয়স প্যাম্ফলেট', রচনাবলি, খণ্ড-২২

ভি. আই. লেনিন (১৯১৭) 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', খণ্ড-২৫

ভি. আই. লেনিন (১৯১৮) 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি', খণ্ড-২৮

ভি. আই. লেনিন (১৯১৯), 'গ্রিটিংস ট্যু দ্য হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স', রচনাবলি, খন্ড- ২৯

মাইকেল স্টুর্জা (২০১৭), ‘ দ্য লন্ডন রেভোলিউশন ১৬৪০-১৬৪৩ঃ দ্য ক্লাস স্ট্রাগলস ইন দ্য সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরি ইংল্যান্ড’, দ্য ম্যাড ডাক কোয়ালিশন, নিউ-ইয়র্ক

মাও সে তুং (১৯৩৭), ‘অন কনট্রাডিকশন’, রচনাবলি, খণ্ড-১, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস, পিকিং

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ (১৯৮৩), ‘দ্য ডিসকভারি অব সাব-অ্যাটমিক পার্টিকেলস’, সায়েনটিফিক আমেরিকান লাইব্রেরি, নিউ-ইয়র্ক

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ (১৯৯২), ‘ড্রিমস অব আ ফাইনাল থিয়োরি’, ভিন্টেজ বুকস, নিউ-ইয়র্ক

স্ট্যালিন (১৯৩৯), ‘ডায়ালেকটিক্যাল অ্যান্ড হিসটরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম’, হিস্ট্রি অব দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন (বলশেভিকস), ইনটারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ-ইয়র্ক